POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ
الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ
الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۪
ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ

এবং তোমরা আহার কর এবং পান কর যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমাদের নিকট উষার শুভ্ররেখা কৃষ্ণরেখা হইতে পৃথক দৃষ্টিগোচর হয়। অতঃপর, রাত্রি (আগমণ) পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর।

(আল বাকারা: ১৮৪)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 7

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 17

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 28 এপ্রিল, 2022 26 রমযান 1443 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আযানের কাছাকাছি সময় সেহরি খাওয়া।

১৯২০) হযরত সাহাল বিন সাআদ (রা.) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আমি পরিবারের সঙ্গে যখন সেহরি খেতাম, তখন রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর সঙ্গে সকালের নামায পাওয়ার জন্য তাড়াহুড়ো করতাম।

সেহরি ও ফজরের নামাযের মাঝে কতটা ব্যবধান থাকা উচিত?

১৯২১) হযরত যায়েদ বিন সাবিত (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে নবী (সা.) -এর সঙ্গে আমরা সেহেরি খেয়েছি। অতঃপর তিনি (সা.) নামাযের জন্য দাঁড়িয়েছেন। (কাতাদাহ বলতেন) আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আযান ও সেহরির মাঝে কতটা সময়ের ব্যবধান থাকে? তিনি (সা.) উত্তর দিলেন: পঞ্চাশ আয়াতের সমান।

সেহরি খাওয়ার উপর জোর

১৯২২) হযরত আব্দুল্লাহ্ (বিন উমর) রাজিআল্লাহু আনহু-র পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (সা.) সেহরি না খেয়ে রোযা রাখলে লোকেরা বিনা সেহরিতে রোযা রাখল। এটি তাদের জন্য কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ালে তিনি (সা.) তাদেরকে এমনটি করতে নিষেধ করেন লোকেরা বলল, আপনি তো সেহরি না খেয়ে রোযা রাখেন। তিনি (সা.) বললেন, আমি তোমার মত নই। আমাকে সমানে খাওয়ানো হয় আর পান করানোও হয়।

(সহী বুখারী, ৩য় খণ্ড, কিতাবুস সাউম, কাদিয়ান থেকে প্রকাশিত)

জুমআর খুতবা, ২৫ মার্চ, ২০২২
ভার্চুয়াল সাক্ষাতানুষ্ঠান।
প্রশ্নোত্তর পর্ব
হুযুরের সফর বৃত্তান্ত

অসুস্থ এবং মুসাফির যেন রোযা না রাখে। এখানে একটি আদেশ রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা একথা বলেন নি যে যার শক্তি আছে সে রোযা রাখুক আর যার নেই সে না রাখুক।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাণী

রমযানের তাৎপর্য

'রামাযুন' বলা সূর্যের তাপকে। মানুষ যেহেতু রমযানে যাবতীয় পানাহার এবং দৈহিক সুখসম্ভোগের বিষয়ে সংযমী হয়। দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ্ তা'লার বিধিনিষেধের জন্য একটা উদ্যম ও প্রেরণা অনুভব করে। আধ্যাত্মিক এবং দৈহিক তাপ এবং উষ্ণতার মিলনে রমযান হয়। ভাষাবিদরা বলেন, যেহেতু গরমের মাসে এর সূচনা হয় সেই জন্য রমযান বলা হয়। আমার মতে এটা সঠিক নয় কেননা আরবদের জন্য এটা বিশেষত্ব হতে পারে না। আধ্যাত্মিক 'রময' হল উৎসাহ, উদ্দীপনা এবং ধর্মীয় উষ্ণতা। রামায সেই উষ্ণতাকেও বলা হয় যার দ্বারা পাথর ইত্যাদি উত্তপ্ত হয়ে যায়। (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৯৪)

সফরে রোযা

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)কে প্রশ্ন করা হয় যে সফরে রোযা রাখার বিষয়ে কি আদেশ রয়েছে? হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বললেন: কুরআন থেকে এটাই জানা যায় যে, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ (আল বাকারা: ১৮৫) অর্থাৎ অসুস্থ এবং মুসাফির যেন রোযা না রাখে। এখানে একটি আদেশ রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা একথা বলেন নি যে যার শক্তি আছে সে রোযা রাখুক আর যার নেই সে না রাখুক। আমার মতে মুসাফিরের রোযা রাখা উচিত নয়। আর যেহেতু সাধারণত অধিকাংশ মানুষ রোযা রাখে, তাই কেউ যদি সামঞ্জস্য মনে করে রাখে তবে অসুবিধে নেই। কিন্তু - عِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ এর নির্দেশটিও দৃষ্টিপটে রাখা বাঞ্ছনীয়।"

এর প্রতিক্রিয়ায় মৌলবী নুরুদ্দীন সাহেব (রা.) বলেন: 'এমনিতেও তো মানুষের মাসে কয়েকটি রোযা রাখা উচিত।'

আমি এটুকুই বলতে চাই যে, একবার হযরত আকদস (আ.)বলেছিলেন, সফরে কষ্ট সহ্য করে যে ব্যক্তি রোযা রাখে, প্রকারান্তে সে নিজের পেশিবলে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে চায়, তাঁকে আনুগত্য দ্বারা সন্তুষ্ট করতে চায় না। এটি ভ্রান্ত নীতি। আল্লাহ্ তা'লার প্রতি আনুগত্য এবং তাঁর বিধিনিষেধ মেনে চলার মধ্যেই প্রকৃত ঈমান নিহিত।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৬৬)

সারা দিন অভুক্ত থাকা আর নিজের মুখ বন্ধ রাখার নাম রোযা নয়; কেবল মুখকে পানাহার থেকে সংযত রাখাই নয়, বরং আধ্যাত্মিকভাবে হানিকর বিষয় থেকেও রক্ষা করা।

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন:

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ শব্দে একটি উপকারিতা বর্ণনা করা হয়েছে, এর ফলে রোযাদার পাপ এবং অসৎকর্ম থেকে সুরক্ষিত থাকে। আর এই উদ্দেশ্য এইভাবে পূর্ণ হয়। পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে মানুষের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি প্রখর হয় আর সে সেই সব দোষ-ত্রুটিগুলিকে দেখতে পায় ইতিপূর্বে যেগুলি তার চোখে পড়ত না। অনুরূপভাবে পাপ থেকে মানুষ এমনভাবে রক্ষা পায় যে রসুল করীম (সা.) বলেছেন- সারা দিন অভুক্ত থাকা আর নিজের মুখ বন্ধ রাখার নাম রোযা নয়। কেবল মুখকে পানাহার থেকে সংযত রাখাই নয়, বরং মুখকে আধ্যাত্মিকভাবে হানিকর বিষয় থেকেও রক্ষা করা। মিথ্যাবচন, কুবচন, নিন্দাবাদ ও কলহ থেকেও বিরত থাকা। জিহ্বার উপর নিয়ন্ত্রণ রাখার নির্দেশ তো সব সময়ের জন্য, কিন্তু রোযাদার বিশেষভাবে নিজের জিহ্বার উপর সংযম রাখে। কেননা, এমনটি না করলে রোযা ভেঙ্গে যায়। আর কোনও ব্যক্তি যদি এক মাস পর্যন্ত নিজের জিহ্বার উপর সংযম রাখে, তার জন্য এই বিষয়টি বছরের অবশিষ্ট এগারো মাসেও তার জন্য নিরাপত্তার কারণ হয়। আর এভাবে রোযা তাকে সব সময়ের জন্য পাপ থেকে রক্ষা করে আসে।

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ আয়াতে রোযার আরও একটি উপকারিতা বর্ণিত হয়েছে যে, এর পরিণামে তাকওয়ার উপর অবিচলতা অর্জিত হয়। আর মানুষ আধ্যাত্মিকতার উচ্চ মার্গ অর্জন করে। রোযার কল্যাণে কেবল ধনীরাই যে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করে তা নয়, বরং দরিদ্ররাও নিজেদের মধ্যে এক নতুন আধ্যাত্মিক বিপ্লব অনুভব করে আর তারা আল্লাহ্‌র সহিত মিলনকে উপভোগ করে। দরিদ্ররা সারা বছর অভাব অনটনের মধ্যে জীবনযাপন করে, এমনকি অনেক সময় কয়েক দিন পর্যন্ত অনাহারেও কাটাতে হয়। আল্লাহ্ তা'লা রমযানের মধ্য দিয়ে তাদেরকে স্বান্তনা প্রদান করেছেন যে, সেই অনাহার যাপনের মধ্যেও তারা পুণ্য লাভ করতে পারে আর খোদা তা'লার কারণে অনাহারে থাকা এতবড় পুণ্যের কাজ যে, এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে- আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন- اَلصَّوْمُ لِيْ وَاَنَا اَجْزِيْ بِهٖ অর্থাৎ সমস্ত পুণ্যের উপকারিতা এবং প্রতিদান পৃথক পৃথক। কিন্তু রোযার প্রতিদান আমি নিজেই। আর খোদা তা'লার সঙ্গে সাক্ষাতের পর মানুষ

শেষাংশ শেষের পাতায়

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

বি:দ্রঃ- সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বিভিন্ন সময়ে নিজের চিঠিতে এবং এম.টি.এর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে নির্দেশনা প্রদান করেছেন, সেগুলি থেকে পাঠকদের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

প্রশ্ন: কুরআন করীমের ত্রিশটি পারা হওয়ার ক্ষেত্রে কি প্রজ্ঞা নিহিত রয়েছে? । হুযুর আনোয়ার (আই.) ১০ জানুয়ারী, ২০২১ এর সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা দিয়ে বলেন-

আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমকে আয়াত এবং সূরা রূপে নাযেল করেছেন। অতঃপর আঁ হযরত (সা.) খোদা প্রদত্ত দিক-নির্দেশনার সাহায্যে একে বর্তমান রূপে বিন্যাস্ত করেছেন। কুরআন করীমের মঞ্জিল, পারা এবং রুকুতে বিভক্ত হওয়ার বিষয়ে বলতে গেলে এগুলি পরবর্তীকালে লোকেরা নিজেদের পড়ার সুবিধার্থে বিভিন্ন যুগে এমনটি করেছে। এই কারণে কুরআন করীমের প্রাচীন অনুলিপিতে এমন কোনও ভাগাভাগি নেই।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, কিছু কিছু সাহাবী সাংসারিক দায়িত্ব পালন না করেই কেবল নফল ইবাদতে নিমগ্ন থাকতেন। তাদের সম্পর্কে জানতে পেরে আঁ হযরত (সা.) তাদেরকে যে উপদেশাবলী দান করেছিলেন, তার মধ্যে একটি হল সমগ্র কুরআন তিলাওয়াত করে ফেলার ক্ষেত্রে সময়ের সীমা বেঁধে দেওয়া।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর বিন আস (রা.) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, হুযুর (সা.) বলেছেন, পুরো এক মাসে কুরআন মজীদ শেষ করো। তিনি নিবেদন করেন, হে রসুলুল্লাহ! আমি এর থেকে বেশি সামর্থ রাখি। আঁহযরত (সা.) বললেন, কুড়ি দিনে শেষ করো। তিনি (রা.) নিবেদন করলেন, আমি এর থেকেও বেশি সামর্থ রাখি। আঁ হযরত (সা.) বললেন, দশ দিনে শেষ করো। তিনি বললেন, আমি এর থেকেও বেশি শক্তি রাখি। আঁ হযরত (সা.) বললেন, সাত দিনে শেষ করো, নিজেকে এর থেকে বেশি কষ্টে ফেলো না। কেননা, তোমার স্ত্রীরও তোমার উপর অধিকার রয়েছে।তোমার অতিথিদেরও তোমার উপর অধিকার রয়েছে। তোমার শরীরেরও তোমার উপর অধিকার রয়েছে।

(সহী মুসলিম, কিতাবুস সিয়াম)

অনেকের মতে আঁ হযরত (সা.)-এর নির্দেশের আলোকে পরবর্তী কালে লোকেরা নিজেদের সুবিধার্থে কুরআন করীমকে ত্রিশটি পারা ও সাতটি মঞ্জিলে বিভক্ত করেছে, যাতে সর্বাধিক একমাস এবং সর্বনিম্ন সাত দিনে কুরআন করীমের তিলাওয়াত কারীদের জন্য সহজসাধ্যতা তৈরী হয়। আবার কিছু লোকের মতে ছোটদেরকে কুরআন করীম পড়ানোর সময় ছাত্রদের এবং শিক্ষকদের সুবিধার্থে মধ্যবর্তী যুগে কুরআন করীমকে মঞ্জিল এবং পারায় বিভক্ত করা হয়েছে। আর এই বিভাজন বিষয়বস্তুর দিক থেকে নয়,বরং কুরআন করীমের পৃষ্ঠা সংখ্যা অনুসারে করা হয়েছে।

কুরআন করীমের রুকুতে বিভাজন সম্পর্কে বলা হয় যে, এই কাজ হাজ্জাব বিন ইউসুফ -এর যুগে হয়েছিল আর কিছু কিছু রেওয়ায়েত অনুসারে এই বিভাজনটি করেছিলেন হযরত উসমান (রা.)। এছাড়াও নামাযের রাকাতের জন্য কুরআন করীমের একটি নির্দিষ্ট অংশ তিলাওয়াতের সুবিধার জন্য রুকুতে বিভক্ত করা হয়েছে।

তবে কারণ যাইহোক না কেন, এই বিষয়টি গবেষণা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত যে কুরআন করীমের এই বিভাজন আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে হয় নি আর তা আঁ হযরত (সা.) নির্দেশিতও নয়। বরং পরবর্তীকালের বিভাজন। এই কারণে আরব এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অনারবদের এলাকায় প্রকাশিত কুরআন করীমের সংস্করণগুলিতে পারা নির্ধারণের ক্ষেত্রে তারতম্যও পাওয়া যায়। কিন্তু এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, এই বিভাজনের কারণে কুরআন করীমের অর্থ বুঝতে কোন তারতম্য ঘটে না। আর কুরআন করীমের সত্যতার বিষয়েও কোনও তারতম্য ঘটে না।

প্রশ্ন: সুরা হাকা-র একটি আয়াতের 'উজুন' সম্পর্কে লিখে দিক-নির্দেশনা চেয়েছেন যে, এর দ্বারা কি রেকর্ডিং মেশিনকে বোঝানো হয়েছে? কেননা কান কোন জিনিসকে ধারণ করে রাখতে পারে না, বরং মন ও মস্তিষ্ক মনে রাখে। হুযুর আনোয়ার (আই.) ১০ই জানুয়ারী, ২০২১ তারিখের চিঠিতে লেখেন-

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) তফসীর সাগীরে সূরা হাকার এই আয়াতটির অনুবাদ এভাবে করেছেন- যাতে এই (ঘটনা) তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন আখ্যায়িত করে আর শ্রবণকারীরা শুনে (এবং হৃদয়ের মধ্যে স্মরণ করে রাখে)"

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) তাঁর এই ব্যাখ্যামূলক অনুবাদে একথা স্পষ্ট করেছেন যে, কানের কাজ হল কেবল শোনা। স্মরণ রাখার কাজ মনের বা মস্তিষ্কের। সুরা বাকারার তফসীর বর্ণনা করতে গিয়ে এক স্থানে হুযুর (রা.) কান এবং চোখের কার্যপদ্ধতি স্পষ্ট করতে গিয়ে একটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিষয় বর্ণনা করে বলেছেন- 'আমরা যখন কোনও শব্দ শুনি, তখন এর অর্থ হল এই শব্দটি বাইরে থেকে এসেছে।কেননা কানের পর্দার গঠন প্রকৃতি এমন যে, বাতাসের কম্পন যখন কানের উপর এসে পড়ে, তখন কানের মধ্যে কম্পন তৈরী হয়। শব্দ তরঙ্গ অর্থাৎ প্রকম্পন সৃষ্টি হয়। আর এই তরঙ্গ মস্তিষ্কে সঞ্চারিত হয়ে শ্রবনযোগ্য তরঙ্গে পরিণত হয়। এই কম্পনগুলি যখন রেডিও-র ভালব-এ মধ্যে পড়ে আর রেডিও সেগুলিকে শব্দে পরিণত করে। মানবদেহের গঠন প্রকৃতিতে রেডিও হল কান আর মস্তিষ্কের স্নায়ুগুলি হল ভালব। এগুলির মাধ্যমে যে গতিবিধি মস্তিষ্কে সঞ্চারিত হয় সেগুলি সেখানে শব্দ হিসেবে শোনা যায়। ..... আর যা কিছু আমরা দেখি সেগুলিও গতিবিধি, যেগুলিকে চোখ প্রতিবিম্বে রূপান্তরিত করে। যা কিছু তোমার সামনে গড়া হয় সেগুলি চিত্র নয়, বরং সেগুলি ফিচার অর্থাৎ লেখচিত্র যা চোখের মাধ্যমে মস্তিষ্কে সঞ্চারিত হয়। এই কারণেই রেডিও সেটের মাধ্যমে আজকাল ছবিও বাইরে পাঠানো শুরু হয়েছে।"

(তফসীর কবীর, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪০৩)

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর এই সূক্ষ্ম তফসীরের আলোকে আমার মতে সূরা হাকার উল্লেখিত আয়াতে একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন স্মরণ রাখাকে কানের দিকে এই কারণে সম্পর্কিত করা হয়েছে যে, কানের মাধ্যমেই শব্দ মন ও মস্তিষ্কে পৌঁছে সংরক্ষিত হয়। এটি ছাড়া কুরআনের এই আয়াতে কান শব্দটিকে রিকার্ডিং মেশিন হিসেবে গণ্য করা আপনার সূক্ষ্মধর্মী ব্যাখ্যা; কুরআন, সুন্নত ও হাদীসের সঙ্গে যদি এর সংঘাত না থাকে, তবে এই ব্যাখ্যায় কোনও অসুবিধের কিছু নেই।

প্রশ্ন: এক ভদ্রমহিলা প্রশ্ন করে পাঠান যে, বাড়িতে ছেলেরা থাকতেও কেবল মেয়েরাই যদি নামায পড়ানোর যোগ্য থাকে, তবে তারা কি নামায পড়াতে পারবে? আর যদি না পারে, তবে কেন পারে না?

হুযুর আনোয়ার (আই.) ১৬ই জানুয়ারী ২০২১ তারিখের চিঠিতে লেখেন-

ইসলামী শিক্ষার সৌন্দর্য হল এতে পুরুষ ও মহিলাদের প্রকৃতি অনুসারে তাদের পৃথক অধিকার ও কর্তব্যাবলী নির্ধারণ করা হয়েছে। নামায বা-জামাতও কেবল পুরুষদের জন্য ফরজ করা হয়েছে, মহিলাদের এ থেকে অব্যহতি দান করা হয়েছে। আর মেয়েদের বা-জামাত নামায পড়াকে কেবল অতিরিক্ত ইবাদতের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। তাই পুরুষদের বর্তমানে কোন মহিলা বা-জামাত নামাযে তাদের ইমাম হতে পারবে না। আঁ হযরত (সা.) এবং তাঁর পর খলীফারা কখনও কোনও মহিলাকে পুরুষদের ইমামতির জন্য নিযুক্ত করেন নি। এই যুগের ন্যায় বিচারক ও মীমাংসাকারী হযরত মসীহ মওউদ (আ.)ও এই একই দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। অনেক সময় অসুস্থতার কারণে যখন বাড়িতে নামায পড়তেন, তখন নিজেই নামাযের ইমামতি করতেন। আর দাঁড়িয়ে নামায পড়লে যেহেতু হুযুর (আ.)-এর মাথা ঘুরত, এই কারণে হযরত আম্মাজানকে পিছনে দাঁড় করানোর পরিবর্তে বাধ্য হয়ে নিজের পাশে দাঁড় করাতেন।

অতএব, কোনও স্থানে যদি পুরুষ ও মহিলা উভয়ে থাকে তবে পুরুষই সেখানে ইমামতি করবে। কেননা যে পুরুষ নামায পড়ার যোগ্যতা রাখে এবং সঠিকভাবে নামায পড়ে, তার ইমামতিতে অন্যদের নামায সঠিক হবে।

সদকাতুল ফিতর আদায়

আলহামদোলিল্লাহ এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে পবিত্র রমযান মাস শুরু হয়েছে। ইসলামে ফিতরানা আদায়ের জন্য এক 'সা' (যা প্রায় ২ কিলো ৭৫০ গ্রাম) -এর হার নির্ধারিত রয়েছে। জামাতের সদস্যদের উচিত সঠিকহারে রমযানের প্রথম বা দ্বিতীয় ভাগের মধ্যে সদকাতুল ফিতর দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা। যেহেতু ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ফসলের (চাউল, গম)-এর মূল্য ভিন্ন। এই কারণে নিজেদের স্থানীয় মূল্যে নির্ধারিত হার (২ কিলো ৭৫০ গ্রাম ফসল) অনুসারে ফিতরানার চাঁদা দান করুন।

এবছর সাদকাতুল ফিতর মাথাপিছু ৭০ টাকা নির্ধারিত হয়েছে। স্থানীয় জামাতে অভাব-পীড়িত ও সদকা পাওয়ার যোগ্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ থাকলে সদকাতুল ফিতরের মোট অর্থের নব্বই শতাংশ পর্যন্ত মজলিসে আমেলার পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিতরণ করা যেতে পারে। অবশিষ্ট অর্থ মরকযে জমা করে দিতে হবে। জামাতে যদি দরিদ্র ও সদকা পাওয়ার মত ব্যক্তি না থাকে তবে সেই জামাতে সংগৃহীত অর্থের সম্পূর্ণটাই সদর আঞ্জুমান আহমদীয়ার জামাতী খাতায় জমা করে দিতে হবে।

স্পষ্ট থাকে যে, ফিতরানার অর্থ মসজিদ বা অন্যান্য প্রয়োজনে খরচ করার অনুমতি নেই।

(নাযির বায়তুল মাল আমাদ, কাদিয়ান)

জুমআর খুতবা

জেনে রেখো, আমার জামা'ত প্রতিষ্ঠা যদি নিছক ব্যবসা হয়ে থাকে, তবে এর নাম-চিহ্নও থাকবে না। কিন্তু যদি এটি খোদার পক্ষ থেকে হয়ে থাকে এবং নিঃসন্দেহে এটি তাঁরই পক্ষ থেকে, তাহলে সারা পৃথিবীও যদি এর বিরোধিতা করে তবুও এটি বৃদ্ধি পাবে ও বিস্তৃত হবে এবং ফিরিশতারা এর সুরক্ষা বিধান করবে, [ইনশাআল্লাহ্]। যদি একজনও আমার সাথে না থাকে এবং কেউ-ই সাহায্য না করে, তবুও আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি, এই জামা'ত সফল হবে,

অতএব স্মরণ রেখ! আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে যখন সাহায্য আসে তখন কেউ তা প্রতিহত করতে পারে না।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র জীবনচরিত এর বিষয়ে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর বর্ণনা।

এসব ঘটনা একদিকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতা উপস্থাপন করে আর অপরদিকে আমাদের সংশোধন এবং নিজেদের ঈমানের দৃঢ়তা (অর্জনের) প্রতিও মনোযোগী করে। এগুলো শুনে যদি আমাদের সংশোধন এবং উন্নতি করার প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি না হয় তাহলে এগুলো শুনে কোনো লাভ নেই।

মোমেনদের জন্য পরীক্ষা আসাও অবশ্যম্ভাবী। অতএব, যদি ধৈর্য ধারণ কর আর দোয়া কর, তবে আল্লাহ্ সেই সমস্ত বিপদ থেকে পরিত্রাণ করবেন।

কুর্দিশ ভাষায় প্রথম আহমদীয়া ওয়েব সাইটের সূচনা।

পৃথিবীর বর্তমান অবস্থার জন্য দোয়ার প্রতি আহ্বান। আল্লাহ্ তা'লা সকলকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করুন আর মানুষকে বিবেক দান করুন আর তারা যেন নিজেদের সৃষ্টিকর্তাকে চেনে।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে **মুবারকে প্রদত্ত** ২৫ মার্চ, ২০২২, **এর জুমুআর খুতবা (২৫ আমান, ১৪০১ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:দুদিন পূর্বে ২৩ মার্চ -এর দিন ছিল। জামা'তের মাঝে এ দিনটি 'মসীহ্ মওউদ দিবস'নামে পরিচিত। এদিন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সর্বপ্রথম বয়আত নিয়েছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এ দিনটি উপলক্ষ্যে জামা'তে বিভিন্ন সভা-সমাবেশও অনুষ্ঠিত হয় যেখানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবি এবং যুগের নিরিখে তাঁর আগমনের প্রয়োজনীয়তা, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সম্পর্কে মহানবী (সা.)-এর বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণী, তাঁর জীবনচরিতের বিভিন্ন আঙ্গিক ইত্যাদি বর্ণনা করা হয়। যুগের চাহিদা অনুসারে তাঁর আগমনের গুরুত্ব সম্পর্কে এক স্থানে তিনি এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, এ যুগে আল্লাহ্ তা'লা অনেক কৃপা করেছেন এবং স্বীয় ধর্ম, অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম এবং মহানবী (সা.)-এর সমর্থনে আত্মাভিমান প্রদর্শন করে এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করেছেন যিনি তোমাদের মাঝে কথা বলছেন যেন তিনি সেই জ্যোতির প্রতি মানুষকে আহ্বান করেন। (এই) যুগে যদি এমন ফিতনা ও নৈরাজ্যের উদ্ভব না ঘটত এবং ধর্মকে মিটিয়ে দেওয়ার যেসব অপচেষ্টা চলছে তা না হতো তাহলে কোন সমস্যাই ছিল না। এরপর আর কাউকে প্রেরণের প্রয়োজন হতো না। কিন্তু এখন তোমরা দেখছ যে, ডান-বাম সর্বত্রই ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য সকল জাতি উঠে পড়ে লেগেছে। সবদিকে, অর্থাৎ ডান-বাম যেদিকেই দেখ একই (ষড়যন্ত্র) যে, কীভাবে ইসলামকে ধ্বংস করা যায়।

যখন তিনি দাবি করেন তখনও এ অবস্থাই বিরাজ করছিল এবং এ চেষ্টাই করা হচ্ছিল আর এখনও সেই একই অবস্থা। কিন্তু মুসলমান হওয়ার দাবিদার অধিকাংশ লোকই এ বিষয়টি বুঝতে পারে না।

যাহোক তিনি বলেন, বারাহীনে আহমদীয়াতেও আমি উল্লেখ করেছি যে, ইসলামের বিরুদ্ধে ছয় কোটি পুস্তক রচনা ও সংকলনের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু অদ্ভুত বিষয় হলো, ভারতবর্ষের মুসলমানদের সংখ্যাও ছয় কোটি (অর্থাৎ যখন তিনি একথা বলেছেন তখন মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ছয় কোটি) আর ইসলামের বিরুদ্ধে রচিত পুস্তকের সংখ্যাও একই। এসব রচনার বাড়তি যা রয়েছে তা যদি ছেড়েও দেওয়া হয় তবুও আমাদের বিরোধীরা একটি করে পুস্তক পাক-ভারতের প্রত্যেক মুসলমানের হাতে ধরিয়ে দিয়েছে। যদি আল্লাহ্ তা'লার আত্মাভিমান জাগ্রত না হতো এবং إِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ - এর প্রতিশ্রুতি সত্য না হতো তাহলে নিশ্চিতভাবে জেনে রেখো, পৃথিবীর বুক থেকে ইসলাম উঠে যেত এবং এর নাম-চিহ্নও মুছে যেত। কিন্তু না, এমন হওয়া সম্ভব নয়। কেননা আল্লাহ্ তা'লার অদৃশ্য হাত এর সুরক্ষা করছে।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৭৩)

স্বীয় দাবির পর তিনি (আ.) একথা বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সমর্থন কীভাবে তাঁর সাথে রয়েছে আর পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আল্লাহ্ তা'লার ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ তাঁর সপক্ষে কীভাবে পূর্ণ হচ্ছে এবং নিজ মাহ্দী ও মসীহ্র সমর্থনে মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ কীভাবে পূর্ণ হচ্ছে। যেমনটি আমি বলেছি, (এ সংক্রান্ত) বিভিন্ন সভা হয়ে থাকে তাতে আপনারা এসব কথা শুনে থাকবেন, এম.টি.এ.তে বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়ে থাকে সেখানেও শুনে থাকবেন এবং এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও হয়ে থাকবে- এসব কথা শ্রোতামণ্ডলীর শোনা উচিত। এখন আমি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণিত কিছু কথা তুলে ধরব।

এগুলো সেসব ঘটনা বা বিষয় যা হযরত মুসলহ্ মওউদ (রা.) স্বয়ং দেখেছেন, অথবা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছ থেকে শুনেছেন, কিংবা কোন কোন বর্ণনাকারী তাঁকে শুনিয়েছেন যারা নিজেরা তা দেখেছেন। এসব বর্ণনাকারীর মাঝে আপন ও পর উভয়েই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এসব ঘটনা একদিকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতা উপস্থাপন করে আর অপরদিকে আমাদের সংশোধন এবং নিজেদের ঈমানের দৃঢ়তা (অর্জনের) প্রতিও মনোযোগী করে। এগুলো শুনে যদি আমাদের সংশোধন এবং উন্নতি করার প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি না হয় তাহলে এগুলো শুনে কোনো লাভ নেই। এজন্য এ দৃষ্টিকোণ থেকে এসব কথা আমাদের শোনা উচিত আর এখনও শুনুন যাতে আমরা আমাদের ঈমানকে দৃ ঢ় করতে পারি এবং এগুলোকে আমরা আমাদের ঈমান দৃঢ় করার মাধ্যম বানাতে পারি।

নবীদের বিরোধীদের সর্বদাই এই অভিযোগ ছিল যে, তারা যে জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের কথা বলেন তা তাদেরকে অন্য কেউ শিখিয়ে দেয়। এমনকি মহানবী (সা.)-এর প্রতিও পবিত্র কুরআন সম্পর্কে এই আপত্তি রয়েছে যে, তাঁকে অন্য কেউ শিখিয়ে দিত (নাউযুবিল্লাহ্)। অথচ এটি সেই মহাগ্রন্থ যার কোনো দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা সম্ভব নয়- এটি আল্লাহ্ তা'লার চ্যালেঞ্জ। অতএব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সম্পর্কে আমি উল্লেখ করছি যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) 'বারাহীনে আহমদীয়া' লিখার সময় সূচনাতেই লিখেন, আমি (এটি) এত সংখ্যায় লিখব। কিন্তু এরপর আল্লাহ্ তা'লা তাকে প্রত্যাদিষ্টের মর্যাদা দান করলে তিনি (আ.) বলেন, এই বিষয়টি এখন আল্লাহ্ তা'লা নিজ হাতে নিয়ে নিয়েছেন, এ কাজের দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'লা নিজ হাতে তুলে নিয়েছেন। পরিস্থিতি অনুসারে তিনি যে বিষয়বস্তু শিখাতে থাকবেন আমিও তা-ই বর্ণনা করতে থাকব। তখন বিরোধীরা এই আপত্তি উত্থাপন করে যে, তাঁকে অন্য কেউ লিখে দিত আর তিনি (আ.) তা বর্ণনা করতেন। এ সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তঁ ার এক বক্তৃতায় বলেন, সেই যুগে 'জমিদার' এবং 'এহসান' নামে দুটি পত্রিকা ছিল।এ দুটি বিরোধী পত্রিকা একথাও লিখতে থাকে যে, মৌলবি চেরাগ দ্বীন হায়দ্রাবাদী নামে কেউ একজন ছিলেন আর তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে এসব প্রবন্ধ লিখে পাঠাতেন যা তিনি (আ.) বারাহীনে আহমদীয়ায় ছাপিয়েছেন আর যতদিন পর্যন্ত তার পক্ষ থেকে প্রবন্ধ আসা অব্যাহত ছিল তিনি (আ.) পুস্তক লিখতে থাকেন। কিন্তু যখনই তিনি প্রবন্ধ

পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছেন তখন তাঁর পুস্তক লেখাও শেষ হয়ে গেছে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমি বুঝতে পারি না যে, মৌলবি চেরাগ আলী সাহেবের কী হয়েছে? মানুষ যে বলে, তিনি লিখে দিতেন, (কাজেই) তার কী হয়ে গেছে যে, তিনি ভালো ভালো যেসব নিগুঢ় তত্ত্ব চিন্তা করেন তা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে লিখে পাঠিয়ে দেন কিন্তু আশপাশের সাধারণ বিষয়গুলো নিজের কাছে রেখে দেন। মৌলবি চেরাগ আলী সাহেবই যদি (সত্যিকার) প্রণেতা হয়ে থাকেন তাহলে বারাহীনে আহমদীয়ার বিপরীতে তার পুস্তকগুলো রেখে দেখা যাক। তার কিছু পুস্তক রয়েছে সেগুলোকে বারাহীনে আহমদীয়ার বিপরীতে রেখে দেখুন! এগুলোর মধ্যে কি আদৌ কোন সাদৃশ্য রয়েছে? কোথায় বারাহীনে আহমদীয়া আর কোথায় তার লেখনী। তাহলে কী কারণ যে, অন্যকে তো তিনি এমন প্রবন্ধ লিখে দিতে পারতেন যার কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না কিন্তু যখন নিজের নামে কোন প্রবন্ধ প্রকাশ করতে গিয়েছেন তখন তাতে সেই বিষয়টিই সৃষ্টি হয় নি। অতএব প্রথম বিষয় হলো, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে প্রবন্ধ লিখে পাঠানোর তার কী প্রয়োজন ছিল আর যদি পাঠাতেনই তাহলে উত্তম জিনিস নিজের কাছে রাখতেন এবং সাধারণ জিনিস অন্যকে দিতেন। যেভাবে যওক সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে, যওক নামের এক কবি ছিলেন তার সম্পর্কে সবাই জানে যে, তিনি জাফরকে, অর্থাৎ বাহাদুর শাহ্ জাফরকে কবিতা লিখে দিতেন। অথচ 'দিওয়ানে যওক' এবং 'দিওয়ানে জাফর'এখন দুটোই পাওয়া। সেগুলো দেখলে সুস্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হয় যে, যওকের কথার মধ্যে যে বাগ্মিতা ও গভীরতা রয়েছে তা জাফরের কথায় নেই। এ থেকে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে, তিনি যদি জাফরকে কোন জিনিস দিতেন তাহলে তা তার উদ্বৃত্ত হতে দিতেন আর ভালো জিনিস দিতেন না। যদিও জাফর বাদশাহ্ ছিলেন। মোটকথা প্রত্যেক বিবেকবান মানুষ এটি বুঝতে পারবে যে, মৌলবি চেরাগ আলী যদি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে প্রবন্ধ লিখে পাঠাতেন তাহলে তার উচিত ছিল তত্ত্বজ্ঞানের উৎকৃষ্ট বিষয়গুলো নিজের কাছে রাখা এবং সাধারণ জ্ঞানের কথাগুলো হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে লিখে দেওয়া। কিন্তু মৌলবি চেরাগ আলী সাহেবের বইপুস্তকও রয়েছে আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তক পুস্তিকাও আছে। এখন সেগুলো পাশাপাশি রেখে দেখুন- সেগুলোর মধ্যে কোনক্রমেই তুলনা করা যায় না। তিনি, অর্থাৎ মৌলবি চেরাগ আলী সাহেব তো তার পুস্তকগুলোতে বাইবেলের উদ্ধৃতি জমা করে রেখেছেন। কিন্তু অপরদিকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) পবিত্র কুরআনের সেসব তত্ত্বজ্ঞান উপস্থাপন করেছেন যা বিগত তেরোশ বছরে কোন মুসলমান চিন্তাও করে নি। এসব মা'রেফত ও তত্ত্ব জ্ঞানের শত ভাগের এক ভাগ, বরং সহস্র ভাগের এক ভাগও তার বইপুস্তকে নেই।

(ফাযায়েলুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১৪, পৃ: ৩৫০)

এরপর অন্য যেসব মৌলবি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে হইচই করে থাকে সেসব মৌলবি ও বিরুদ্ধবাদীর হইচই এবং বিরোধিতার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (রা.) একস্থানে বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন দাবি করেন তখন তাঁর এবং তাঁর অনুসারীদের অবস্থা বাহ্যিকভাবে খুবই দুর্বল ছিল।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, "হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবির পূর্বে আমার জন্ম হয়। আমি প্রারম্ভিক যুগ না দেখলেও এর নিকটতম যুগ দেখেছি, অর্থাৎ আমার জ্ঞান হওয়ার পর। সে যুগও জামা'তের দুর্বলতার যুগ ছিল। মৌলবিরা মানুষকে বিভিন্নভাবে উত্তেজিত করতো এবং সম্ভব্য সকল পন্থায় দুঃখকষ্ট দিত।" (খুতবাতে মাহমুদ, ৮ম খণ্ড,পৃ: ২৪৮)

কিন্তু কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে নি। আল্লাহ্ তা'লার যেসব কাজ ছিল তা হতে থাকে।

এরপর যেসব বিরোধিতা হচ্ছিল সে সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কী প্রতিক্রিয়া ছিল- (এ সম্পর্কে) হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে আমি অনেক বার শুনেছি, মানুষ যখন গালি দেয় তখনও (একথা ভেবে) খারাপ লাগে যে, মানুষ আমাদের গালি দিয়ে কেন তাদের পরকাল নষ্ট করছে? আবার গালি না দিলেও আমার কষ্ট হয়, কেননা বিরোধিতা ছাড়া জামা'তের উন্নতি হয় না। গালি দেওয়ার ফলে এই বিরোধিতার কারণে জামা'তের বার্তা (অন্যের কাছে) পৌঁছে যায়। তিনি (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন, অতএব গালি শুনেও আমাদের ভালো লাগে, তাই নানাবিধ আপত্তি কিংবা মানুষের গালমন্দের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা উচিত নয়।

পুনরায় তিনি (রা.) পাঞ্জাবী ভাষার একটি প্রবাদ বাক্য বর্ণনা করেন যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন আর সেটি হলো 'উঠ উড়ান্দে ই লাদ্দে জান্দে নে', অর্থাৎ উট চিৎকার করতে থাকলেও মালিক তার পিঠে হাত বুলিয়ে মালামাল চাপিয়েই দেয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) উপদেশ দিয়ে বলেন, অনুরূপভাবে মানুষ যা-ই বলুক না কেন তোমরা নম্রতা ও প্রীতিপূর্ণ আচরণ কোরো। (খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-১৫, পৃ: ২৬৫)

আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করবেন। এসব লোকের মধ্য থেকেই মান্যকারীরা সৃষ্টি হবে। এসব বিরোধিতা সম্পর্কে একস্থানে তিনি (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন দাবি করেন তখন অল্পকিছু মানুষই তাঁর মান্যকারী ছিল। কিন্তু এরপর আথমের সাথে যখন মুবাহাসা হয় তখন মানুষ একটি পরীক্ষায় পড়ে যায় আর তারা মনে করে তাঁর (আ.) ভবিষ্যদ্বাণী আক্ষরিকভাবে পূর্ণ হয় নি। এরপর লেখরামের সাথে তাঁর মোকাবিলা হয়। তখন তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অত্যন্ত প্রতাপের সাথে পূর্ণ হলেও হিন্দুদের মাঝে তাঁর বিরুদ্ধে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে আর তারা তাঁর ভীষণ বিরোধিতা আরম্ভ করে। অনুরূপভাবে যখন মৌলবি মুহাম্মদ হোসেন বাটালভীর ফতোয়ার যুগ আসে তখনও জামা'তের ওপর বড় বিপদ নেমে আসে। এরপর যখন ডাক্তার আব্দুল হাকীমের ধর্মত্যাগের যুগ আসে তখন জামা'ত আরেক বিপদের সম্মুখীন হয়। মোটকথা, বিভিন্ন সময়ে এমন প্রবলভাবে বিরোধিতার ঝড় ওঠে, যারা দেখেছে তারা ধরে নিয়েছে যে, এখন এরা, অর্থাৎ জামা'ত ধ্বংস হয়ে যাবে, কিন্তু খোদা তা'লা এই সমস্ত বিপদ বা ঝামেলা দূর করার উপকরণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন আর সেসব ফিতনা জামা'তকে ধ্বংস করার পরিবর্তে জামা'তের উন্নতি ও সম্মানের কারণে পরিণত হয়েছে।

আর আজও এমনটি হচ্ছে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, "তোমরা দেখে নাও, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর যুগেও বিরোধিতার ঝড় উঠেছিল, জামা'তের বিরুদ্ধে কীরূপ বিরোধিতা সৃষ্টি হয়েছে, নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়েছে আর মানুষ কীরূপে ধরে নিয়েছে যে, এখন এই জামা'ত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে ও প্রতিবার এ জামা'ত ধ্বংস হওয়ার পরিবর্তে খোদা তা'লার অপার কৃপায় পূর্বের তুলনায় অধিক উন্নতি করেছে।"

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-৩৩, পৃ: ২৯৮)

মোটকথা, এই হলো জামা'তের ইতিহাস আর ঐশী জামা'তের ইতিহাস এমনই হয়ে থাকে।

বিরোধিতার এই ধারাও অব্যাহত থাকে। এখনও এমনই হয় আর এসব বিরোধিতার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেই জামা'ত উন্নতি করতে থাকে আর এখনও ইনশাআল্লাহ্ উন্নতি করবে আর করছেও বটে। বিরুদ্ধবাদীরাও জোর প্রচেষ্টা করে, মুনাফেকরাও সর্বাত্মক চেষ্টা করে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা আপন কাজ অবশ্যই পূর্ণ করেন। আল্লাহ্ যে কাজের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা তিনি পূর্ণ করেই ছাড়বেন, ইনশাআল্লাহ্ ।

বিরোধিতা সম্পর্কে এক বক্তৃতায় তিনি আরও বলেন, এর একটি দিক এটিও রয়েছে যে, মানুষের মাঝে বৈরিতা থাকে আর এসব বৈরিতার কারণে তারা আমাদের কথা শোনার প্রতি মনোযোগী হয় না। তাদের হৃদয়ে ক্রোধের সৃষ্টি হয়। এ জিনিস আমাদের জন্য ক্ষতির কারণই হয়ে থাকে। কিন্তু এর আরেকটি দিকও আছে আর তা হলো, কোন ব্যক্তি যখন বিরোধিতামূলক কোনো কথা শুনে তখন তারা যাচাই করতে উৎসুক হয় যে, আচ্ছা! এরা কতটা নোংরা লোক তা আমিও গিয়ে দেখি। আর তারা যখন যাচাই করে দেখে তখন তারা হতবাক হয়ে যায় যে, তারা আমাকে যেসব কথা বলেছিল আসল বিষয় তো সম্পূর্ণ ভিন্ন। অর্থাৎ বিরুদ্ধবাদীরা যা বলেছিল তা তো আহমদীদের কথা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আর এভাবে তারা হেদায়েত তথা সত্যকে গ্রহণ করে নেয়।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আমি ছোট ছিলাম কিন্তু আমার মনে আছে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মসজিদে বসে ছিলেন,সেখানে বৈঠক চলছিল। রামপুর থেকে এক ব্যক্তি আসে। তিনি মূলত লখনৌ বা তার আশপাশের অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন, কিন্তু থাকতেন রামপুরে। উচ্চতায় খাট, হালকা পাতলা গড়নের মানুষ ছিলেন; সাহিত্যিক ও কবিও ছিলেন। তাকে রামপুরের নবাব সাহেব উর্দু প্রবাদের অভিধান লেখার দায়িত্বে নিযুক্ত করে রেখেছিলেন। এই ব্যক্তি এসে উক্ত বৈঠকে বসেন এবং নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, আমি রামপুর থেকে এসেছি আমি নবাব সাহেবের দরবারের পরিচারক। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে জিজ্ঞেস করেন, এখানে আসতে আপনাকে কে প্রেরণা জুগিয়েছে? তিনি বলেন, আমি বয়আত গ্রহণ করতে এসেছি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আপনাদের ওই দিকে তথা রামপুরের দিকে তো আমাদের জামা'তের সদস্য খুবই কম আর সেদিকে তবলীগও অনেক কম হয় আপনাকে এদিকে আসতে কে প্রেরণা জুগিয়েছে? হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এই বাক্যটি আজও আমার কানে ধ্বনিত হচ্ছে আর আমি আজও সেকথা ভুলতে পারি নি অথচ তখন আমার বয়স ছিল ১৬ বছর। মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রশ্নের উত্তরে তিনি অবলীলায় বলেন, এখানে আসতে আমাকে প্রেরণা জুগিয়েছে মৌলবি সানাউল্লাহ্ সাহেব। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমার স্বল্প বয়সের কারণে আমি তার কথা বুঝতে পারি নি, কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তার উত্তর শুনে হেসে ওঠেন এবং বলেন, তা কীভাবে? উত্তরে তিনি বলেন, মৌলবি সানাউল্লাহ্ সাহেবের বইপুস্তক নবাব সাহেবের দরবারে এসেছিল, নবাব সাহেব সেসব বই পড়তেন এবং আমাকেও পড়ার জন্য বলা

হয়। তখন আমি স্থির করি এই ব্যক্তি যেসব উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছে আমি মির্যা সাহেবের পুস্তকাদি থেকে তা বের করে আসল উদ্ধৃতি দেখে নিব। আমি ভাবলাম এভাবে আমি আহমদীয়াতের বিরুদ্ধে অনেক ভালো তথ্য-উপাত্ত একত্র করে ফেলব। কিন্তু যখন আমি উদ্ধৃতিগুলো বের করে পড়া আরম্ভ করি তখন বুঝতে পারি এগুলোর বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন। এতে আমার আগ্রহ আরও বৃদ্ধি পায় আর আমি ভাবলাম পূর্বাপর আরও কিছু পৃষ্ঠা পড়ে ফেলি। আমি যখন সেগুলো পড়ি তখন অবগত হই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যে মান-মর্যাদা ও মাহত্ম্য মির্যা সাহেব বর্ণনা করেন তা এই বিরোধীদের হৃদয়ে মোটেই নেই। এরপর তিনি বলেন, ফাসীর প্রতি আমার আগ্রহ ছিল। ঘটনাক্রমে ফাসী দুররে সামীন আমার হস্তগত হয়। আমি তা পাঠ করি। আমি যখন এটি পাঠ করা আরম্ভ করি তখন আমার হৃদয় সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার হয়ে যায় আর আমি সিদ্ধান্ত নিই যে, গিয়ে বয়আত করে নিব। তাই বিরোধিতা একদিকে বিশৃঙ্খলার কারণ হয় অপরদিকে এর মাধ্যমে উপকারও হয়।

(চাশমায়ে হিদায়াত, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২২, পৃ: ৪৩৩-৪৩৫)

তাই এ উভয় অবস্থাকে দৃষ্টিপটে রেখে আমাদের উচিত নিজেদের তবলীগের পরিকল্পনা গ্রহণ করা।

নবীর বিরোধিতা না হলেও তারা বিচলিত হয়ে পড়েন, কেননা বিরোধিতাই উন্নতির মাধ্যম যেমনটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন।এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একস্থানে বলেন, মিশরীয় সাম্রাজ্য নিজ যুগে অত্যন্ত খ্যাতনামা পরাশক্তি ছিল। আর এর সম্রাট নিজ শক্তি ও ক্ষমতা নিয়ে গর্ব করতো। অর্থাৎ ফেরাউনের যুগের কথা বলা হচ্ছে। এমন বাদশাহ্ র বিপরীতে হযরত মূসা (আ.)-এর কোন যোগ্যতাই ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি যখন বাদশাহ্ র কাছে যান, বাদশাহ্তাকে হুমকি-ধমকি দেয় আর তাঁকে ও তাঁর জাতিকে ধ্বংস করে দেওয়ার সংকল্প ব্যক্ত করে আর বলে, তুমি যদি বিরত না হও তাহলে তোমাকে ও তোমার জাতিকে ধ্বংস করে দেওয়া হবে, কিন্তু তা সত্ত্বেও হযরত মূসা (আ.) বিরত হন নি, বরং তিনি বলেন, যে বার্তা পৌঁছানোর দায়িত্ব খোদা তা'লা আমাকে দিয়েছেন তা আমি অবশ্যই পেঁ ৗছাব। পৃথিবীর কোন শক্তি আমার কাজে বাধ সাধতে পারবে না। একই অবস্থা হযরত ঈসা (আ.)-এর ছিল আর হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অবস্থাও এমনই ছিল। হযরত মুসলেহ্ ম্ ওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ব্যাপারেও আমরা একই অবস্থা দেখেছি। সব জাতি তার বিরোধী ছিল, এক অর্থে সরকারও তার বিরোধী ছিল। যদিও পরবতীতে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। যাহোক সব জাতি তার বিরোধী ছিল। সকল ধর্মের অনুসারীরা তার বিরোধী ছিল। মৌলবিরা তার বিরোধী ছিল। গদ্দিনশীন পীররা তার বিরোধী ছিল। জনসাধারণ তার বিরোধী ছিল। ধনী ও বিশিষ্ট্য ব্যক্তিবর্গ সবাই তার শত্রু ছিল। এক কথায় চতুর্দিকে বিরোধিতার এক ঝড় বিরাজমান ছিল। লোকজন তাকে অনেক বুঝিয়েছে।

কেউ কেউ বন্ধু প্রতীম হয়ে তাকে বলেছে, আপনি আপনার দাবিসমূহের মাত্রা কিছুটা হ্রাস করুন। কেউ কেউ বলেছে, আপনি যদি অমুক অমুক কথা পরিত্যাগ করেন তবে সবাই আপনার জামা'তের অর্ন্তভুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু এসব কথার প্রতি তিনি কোন ভ্রুক্ষেপ করেন নি বরং সর্বদা তার দাবিসমূহ সুস্পষ্টরূপে উপস্থাপন করতে থাকেন। আর এর ফলে হইচই ও আলোড়ন হতে থাকে।

অত্যাচার-নিপীড়ন হতে থাকে। হত্যাকাণ্ড চলতে থাকে। কিন্তু এমন অত্যাচার-নিপীড়ন সত্ত্বেও আর তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা এমন এক জগতের সাথে ছিল যার সাথে লড়াই করার জাগতিক উপায়-উপকরণের দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর কোন ক্ষমতাই ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি এই মোবাবিলা অব্যাহত রাখেন। আমার ভালোভাবে স্মরণ আছে, আমি বহুবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে বলতে শুনেছি, নবীর দৃষ্টান্ত ঠিক তেমনই যেমনটি লোকেরা বলে যে, এক গ্রামে এক আত্মভোলা বা উন্মাদ নারী ছিল। সে যখন বাইরে বের হতো তখন ছোট ছোট ছেলেরা একত্রিত হয়ে তাকে উত্যক্ত করতো। তাকে উপহাস করতো। তাকে বিরক্ত করতো, তাকে নিয়ে কৌতুক ও হাসিঠাট্টা করতো। প্রতিনিয়ত তাকে বিরক্ত করতো। অপরদিকে সেই নারীও সেই ছেলেদের গালি দিত আর বদদোয়া করতো। অবশেষে গ্রামবাসী নিজেদের মাঝে পরামর্শ করে যে, এই নারী অত্যাচারিত আর আমাদের ছেলেমেয়েরা অযথা বা অন্যায়ভাবে তাকে বিরক্ত করে। অত্যাচারিত অবস্থায় সে তাদেরকে বদ্দোয়া দেয়। পাছে তার বদ্দোয়া কবুল হয়ে যায়। আমাদের উচিত, আমাদের ছেলেমেয়েদের বিরত রাখা, এর ফলে তারা তাকে বিরক্তও করবে না আর সেই নারী তাদেরকে বদ্দোয়াও দিবে না। সুতরাং এই পরামর্শের পর তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, আগামীকাল থেকে গ্রামবাসীরা তাদের ছেলেদেরকে ঘরে আটকে রাখবে এবং তাদেরকে বাইরে বের হতে দিবে না। সুতরাং পরদিন সবাই তাদের ছেলেদের বলে দেয় যে, আজ থেকে বাইরে বের হবে না এবং অধিক সতর্কতাস্বরূপ তারা বাইরে থেকে দরজার শিকল লাগিয়ে দেয়। যখন সকাল হয় আর সেই উন্মাদ নারী প্রতিদিনের ন্যায় নিজ ঘর থেকে বের হয়, তখন কিছু সময় সে এদিক-সেদিক অলিগলিতে ঘুরে বেড়াতে থাকে। কখনো এক গলিতে যায় আবার কখনো অন্য গলিতে। কিন্তু সে কোন ছেলেকে দেখতে পায় না। এর আগে এমন হতো যে, কোন ছেলে তার আঁ াচল ধরে টানছে, কেউ তাকে নিয়ে ব্যঙ্গ করছে, কেউ তাকে ধাক্কা দিচ্ছে, কেউ তার হাত ধরে রেখেছে আর কেউ তাকে নিয়ে ঠাট্টা -বিদ্রুপ করছে। কিন্তু আজ সে কোন ছেলে দেখতে পায় নি। দুপুর পর্যন্ত সে অপেক্ষা করে। কিন্তু সে যখন দেখে যে, কোন ছেলে এখন পর্যন্ত ঘর থেকে বের হয় নি তখন সে বিভিন্ন দোকানে যায় আর প্রত্যেক দোকানে গিয়ে জিজ্ঞেস করে যে, আজকে কি তোমাদের ঘর ভেঙে পড়েছে, বাচ্চারা কি মারা গিয়েছে, আসলে হয়েছে কী যে, তাদেরকে দেখতে পাচ্ছি না? কিছুক্ষণ পর সে যখন এভাবে প্রত্যেক দোকানে গিয়ে এই কথা বলতে থাকে তখন লোকজন বলে যে, গালমন্দ তো এখনও শুনতে হচ্ছে, বদ্দোয়া তো এখনও দিচ্ছে আর ছেলেরা যখন তাকে বিরক্ত করতো তখন এমনই শুনতে হতো। তাই বাচ্চাদেরকে ছেড়েই দাও। তাদেরকে বন্দি করে কেন রেখেছ? হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই গল্প শুনিয়ে বলতেন, এক দৃষ্টিকোণ থেকে নবীদের অবস্থাও এমনই হয়ে থাকে; মানুষ তাঁদেরকে উত্যক্ত করে, বিরক্ত করে, তাঁদের প্রতি অত্যাচার-নিপীড়ন করে এবং এরূপ অত্যাচার-নির্যাতন করে যে, তাঁদের জন্য জীবন-ধারণ করা কঠিন হয়ে যায়। আর এক শ্রেণীর মানুষের হৃদয়ে এই অনুভূতি সৃষ্টি হতে থাকে যে, মানুষ অত্যাচার-নির্যাতন করছে, তাদের এমনটি করা উচিত নয়। তিনি বলেন, কিন্তু তাঁরাও অর্থাৎ নবীগণও পৃথিবীবাসীকে ত্যাগ করতে পারেন না। পৃথিবীবাসী যখন তাঁদেরকে কষ্ট দেওয়া বন্ধ করে দেয় তখন তাঁরা স্বয়ং তাদেরকে আলোড়িত করেন এবং জাগ্রত করেন, বাণী পৌঁছান, কোন কথা বলেন, তবলীগের প্রতি অধিক মনোযোগ নিবদ্ধ করেন যেন পৃথিবীবাসী তাঁদের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করে এবং তাঁদের কথা শুনে। (খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-২৪, পৃ: ২৭২-২৭৪)

অতঃপর নবী রসূলের কঠোরতা প্রসঙ্গে বলা হয়ে থাকে যে, নবী-রসূলরা কেন কঠোরতা প্রদর্শন করেন?

এ সম্পর্কেও তিনি (রা.) বলেন, নবী-রসূলরা নিজ সত্তার জন্য কঠোরতা করেন না, বরং যদি কখনো কঠোরতা ও আত্মাভিমান প্রদর্শন করেও থাকেন তবে আল্লাহ্ তা'লার মর্যাদা প্রতিষ্ঠাকল্পে করে থাকেন। (নতুবা) নিজ সত্তার ব্যাপারে তাঁরা একান্ত বিনয়ী হয়ে থাকেন। এ সম্পর্কে তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি ঘটনা বর্ণনা করেন যে, একবার লাহোরের একটি গলিতে এক ব্যক্তি তাঁকে ধাক্কা দেয়। ফলে তিনি (আ.) পড়ে যান। এতে তাঁর সঙ্গীরা উত্তেজনার বশে তাকে মারতে উদ্যত হয়। কিন্তু তিনি (আ.) বলেন, সে নিজ উত্তেজনার বশে সত্যের প্রতি অনুরাগের কারণে এমনটি করেছে। এই ব্যক্তি মৌলবিদের কথা শুনে এটিই মনে করেছে যে, মির্যা সাহেব মিথ্যাবাদী তাই আমি আমার প্রতিশোধ গ্রহণ করি। সে সত্যের খাতিরে এমনটি করেছে, তাই তাকে কিছু বলো না। অতএব নবী-রসূলগণ ব্যক্তিস্বার্থের জন্য কোন কথা বলেন না, বরং খোদার সম্মান প্রতিষ্ঠাকল্পে বলেন।

তাই এমন ধারণা করা উচিত নয় যে, আল্লাহ্'র নবীগণও এমন আচরণ করে থাকেন। অর্থাৎ যদি কখনো তাঁরা কঠোরতা প্রদর্শন করেও থাকেন, তাঁদের ও সাধারণ মানুষের মধ্যে অনেক বড় পার্থক্য রয়েছে। তাঁরা খোদা তা'লার জন্য করে থাকেন আর সাধারণ মানুষ নিজ ব্যক্তিস্বার্থে করে। অতএব তিনি (আ.) উপদেশ প্রদান করেন যে, যদি কারো মধ্যে এই অনুভূতি থাকে যে, আমি সত্যিকার অর্থে দুর্বল, তাহলে এমন ব্যক্তি কখনো পথভ্রষ্ট হতে পারে না। দুর্বলতার প্রতি তার সজাগ দৃষ্টি থাকবে। সে আল্লাহ্ তা'লার কাছে সাহায্য চাইবে। মানুষ পথভ্রষ্ট তখন হয় যখন সে বিশ্বাস করে যে, আমি সত্যের ওপর রয়েছি আর এরপর তার মাঝে অহংকার সৃষ্টি হয়।

অতএব আমাদের নবীদের আদর্শকে দৃষ্টিপটে রেখে সর্বদা বিনয়ের প্রদর্শন করা উচিত আর এটিই পাপ থেকে আত্মরক্ষারও উপায়।

এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আরেকটি উদ্ধৃতি রয়েছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হযরত মুআবিয়ার নামাযের ঘটনা বর্ণনা করতেন যে, একবার তার ফজরের নামায কাযা হয়ে যায়। কিন্তু এই ভুলের কারণে তিনি অধঃপতিত হন নি, বরং উন্নতি করেছেন। শয়তান তার ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারে নি, বরং তিনি আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের চেষ্টা করেছেন। অতএব যার মাঝে পাপের অনুভূতি রয়েছে সে পাপ থেকে রক্ষা পায়। আর যখন পাপের অনুভূতি থাকে না তখন মানুষ (আরও)পাপে লিপ্ত হয়। অতএব মু'মিনের اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ -এর প্রতি মনোযোগী হওয়া উচিত আর এটি অনুধাবন করা উচিত যে, সে বিপদাপদ থেকে নিরাপদ হয়ে যায় নি। নিরাপদ কেবল তখনই হতে পারে যখন খোদার বাণী তাকে (একথা) অবগত করবে। অতএব মানুষের নিজ আত্মার দুর্বলতা সমূহ গণনা করা উচিত। এমন মানুষের জন্য আধ্যাত্মিকতার পথ উন্মুক্ত হয় যে নিজের (দুর্বলতা) গণনা করতে থাকে। যে ব্যক্তি এরূপ করে না তার জন্য আধ্যাত্মিকতার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। আর এমন মানুষ এরপর পথভ্রষ্ট হয়। ”

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-১৮, পৃ: ১৪১-১৪২)

এক স্থানে তিনি বলেন, জাগতিক পরিশ্রম বা আধ্যাত্মিক পরিশ্রম ছাড়া কোন মানুষ সম্মান লাভ করতে পারে না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন, বর্তমান যুগে সকল প্রকার সম্মান খোদা তা'লা আমার সাথে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন। এখন সম্মান লাভকারী হয় আমার অনুসারীরা হবে অথবা আমার বিরোধীরা হবে।"

সম্মানপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের দেখ! হয় তারাই সম্মান লাভ করবে যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অনুসারী অথবা তারা (পাবে) যারা বিরোধিতা করে (আর) ধর্মীয় দিক থেকে নিজেদেরকে (কিছু একটা) মনে করে। অতএব তিনি অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন, মৌলবি সানাউল্লাহ্ সাহেবকে দেখ! তিনি তেমন কোন বড় মৌলবি নন। তার ন্যায় হাজার হাজার মৌলবি পাঞ্জাব এবং হিন্দুস্তানে রয়েছে। তিনি যদি কোন বিশেষ সম্মান পেয়ে থাকেন তাহলে তা আমার বিরোধিতার কারণে। তারা এটি স্বীকার করুক বা না করুক, কিন্তু বাস্তবতা এটিই যে, আজ আমার বিরোধিতায় নতুবা অনুসরণেই সম্মান নিহিত। মোটকথা মূল কেন্দ্রবিন্দু হলো আমার সত্তা। আর বিরোধীরাও যদি সম্মান পেয়ে থাকে তাহলে তা আমারই কারণে।"

(তফসীর কবীর, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৬১৪)

অতএব আজও আমরা তাই দেখি। মৌলবিদের উপার্জনের ব্যবস্থা যদি হয়ে থাকে বা তারা যদি কোন সম্মান পেয়ে থাকে তাহলে তা আহমদীয়াতের বিরোধিতার কারণে। আর এখন তো রাজনীতিবিদরাও কোন কোন দেশে, বিশেষত পাকিস্তানে আহমদীয়াতের বিরোধিতার মাধ্যমে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করে যেন তাদের পদ বহাল থাকে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে যেসব ষড়যন্ত্র হয়েছে সেগুলোর উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (রা.) বর্ণনা করেন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধেও মানুষ ষড়যন্ত্র করেছে, হত্যা মামলা দায়ের করেছে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা বিরোধীদেরকে তাদের উদ্দেশ্যে সর্বদা বিফল করেছেন। এমনই এক হত্যাচেষ্টার মামলায় মৌলবি মুহাম্মদ হোসেন বাটালভী সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে আদালতে সাক্ষ্য দিতে আসেন আর এই আশা নিয়ে আসেন যে, মির্যা সাহেবের হাতে হাতকড়া পরানো না থাকলেও আদালতে তিনি নাউযুবিল্লাহ্ লাঞ্ছিত অবস্থায় দণ্ডায়মান থাকবেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও যে, সেই ইংরেজ ডেপুটি কমিশনার, যার সামনে মামলা উপস্থাপিত হয়েছিল, সে আমাদের জামাতের বিরোধী ছিল আর জেলায় নিযুক্তি হতেই সে বলেছিল যে, এই ব্যক্তি অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.), যে কিনা আমাদের ঈসা মসীহ্র সম্মানহানি করে তাঁর সম্পর্কে বলে যে, তিনি মারা গেছেন, এখন পর্যন্ত সুরক্ষিত রয়েছে! তাকে কেন (এখনও) শাস্তি দেওয়া হয় নি? আমি এখন তাকে শাস্তি দিব। কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন তার সামনে উপস্থিত হন তখন আল্লাহ্ তা'লা এরূপ হস্তক্ষেপ করেন যে, তাঁর (আ.) চেহারা দেখতেই তার বিদ্বেষ দূর হয়ে যায় আর সে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বসার জন্য তাঁর পাশে চেয়ারের ব্যবস্থা করে দেয় আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাতে বসে পড়েন। মৌলবি মুহাম্মদ হোসেন বাটালভী সাহেব, যিনি এসেছিলেনই এই উদ্দেশ্যে যে, তঁাকে (আ.) লাঞ্ছিত অবস্থায় দেখবেন, তিনি যখন দেখেন যে, তিনি (আ.) চেয়ারে উপবিষ্ট আছেন তখন সহ্য করতে না পেরে তিনি ডেপুটি কমিশনার কাপ্তান ডগলাস-এর কাছে দাবি করেন যে, আমাকেও চেয়ার দেওয়া হোক। তিনি অর্থাৎ মৌলবি মুহাম্মদ হোসেন সাহেব ভেবেছিলেন, অপরাধীর জন্য যদি চেয়ার দেওয়া হয় তাহলে সাক্ষী কেন চেয়ার পাবে না। কিন্তু কাপ্তান ডগলাস যখন এই কথা শুনে তখন সে খুবই অসন্তুষ্ট হয় এবং ক্ষুব্ধ হয়ে বলে, তোমাকে চেয়ার দেওয়া হবে না। মৌলবি মুহাম্মদ হোসেন সাহেব বলেন, আমার পিতাকে লর্ড সাহেবের দরবারে চেয়ার দেওয়া হতো, (তাই) আমাকেও চেয়ার দেওয়া হোক। আমি আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের এডভোকেট আর আমার চেয়ার পাওয়ার অধিকার রয়েছে। তখন কাপ্তান ডগলাস বলে, বেশি কথা বলো না, আর পিছনে সরে যাও এবং সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাক। এখন তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অসম্মান দেখার পরিবর্তে খোদা তা'লা তাকেই লাঞ্ছিত করেছেন। এটি তো ছিল আদালত কক্ষের ভিতরের ঘটনা। মৌলবি সাহেব যখন বাইরে আসেন তখন মানুষকে এটি দেখানোর জন্য যে, ভেতরেও তিনি চেয়ার পেয়েছিলেন, বারান্দায় রাখা একটি চেয়ারে তিনি বসে পড়েন। কিন্তু যেহেতু সেবকরা তা -ই করে থাকে যা তারা তাদের মালিককে করতে দেখে, চাপরাসি যখন দেখে যে, মৌলবি সাহেবকে ভেতরে চেয়ার দেওয়া হয় নি আর এখন তিনি বারান্দায় এসে চেয়ারে বসে আছেন, তখন সে ভাবে যে, যদি সাহেব বাহাদুর এসে দেখে ফেলেন তাহলে আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন। তাই সে দৌড়ে এসে বলে, আপনার এখানে বসার অধিকার নেই, উঠে যান। এভাবে বাইরের লোকেরাও দেখতে পায় যে, মৌলবি সাহেব আদালতের ভিতরে কতটা সম্মান পেয়েছেন। মৌলবি সাহেব এতে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে সামনে এগিয়ে যান, সেখানে কোন এক ব্যক্তি চাদর পেতে রেখেছিল, তিনি তাতে বসে পড়েন। কিন্তু ঘটনাক্রমে চাদরের মালিকও তৎক্ষণাৎ চলে আসে এবং বলে, আমার চাদর ছেড়ে দাও, তোমার বসার কারণে এটি নোংরা হচ্ছে, কেননা তুমি একজন মুসলমানের বিরুদ্ধে খ্রিষ্টানদের পক্ষ হয়ে আদালতে সাক্ষ্য দিতে এসেছ। অতএব স্মরণ রেখ! আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে যখন সাহায্য আসে তখন কেউ তা প্রতিহত করতে পারে না।

পুলিশের অফিসার বা সিপাহী তো দূরে থাক, বড় থেকে বড় মানুষের জীবনেরও কোন ভরসা নেই আর এক সেকেন্ডে আল্লাহ্ তা'লা শত্রুদের ধ্বংস করে দিতে পারেন। অতএব আল্লাহ্ তা'লার সমীপে বিনত হও। আর তাঁরই কাছে দোয়া কর। হ্যাঁ, মু'মিনদের জন্য পরীক্ষা আসাও নির্ধারিত থাকে। অতএব যদি ধৈর্যের সাথে কাজ কর এবং দোয়া কর তাহলে আল্লাহ্ তা'লা সেসব পরীক্ষা দূর করে দিবেন।

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-১৫, পৃ: ১৮৪-১৮৬)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং খ্রিষ্টানদের মাঝে একটি মুবাহেসা বা বিতর্ক হয়েছিল। তার যে বিবরণ রয়েছে তা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকাবলীর মাঝে 'জঙ্গে মুকাদ্দাস' নামে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই মুবাহেসা বা বিতর্কের উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এক স্থানে তাঁর খুতবায় বলেন যে, হযরত খলীফা আউয়াল (রা.) বলতেন, এখানে তিনি হযরত খলীফা আউয়াল (রা.)-এর বরাতে কথা বলেন যে, আথমের সাথে মুবাহেসায় আমরা যে দৃশ্য দেখেছি তাতে প্রথমত আমরা হতভম্ব হয়ে যাই। অর্থাৎ তা দেখে প্রথমত আমরা হতভম্ব হয়ে যাই। আর দ্বিতীয়ত এতে আমাদের ঈমান আকাশসম উচ্চতায় উপনীত হয়। হযরত খলীফা আউয়াল (রা.) বলতেন, খ্রিষ্টানরা যখন মুবাহেসা বা বিতর্কের ফলে ত্যক্ত হয়ে যায় আর তারা দেখতে পায় যে, আমাদের কোন কৌশল কাজে আসে নি, তখন কতিপয় মুসলমানকে নিজেদের সাথে নিয়ে হাসিঠাট্টা করার উদ্দেশ্যে তারা এই দুষ্টামি করে যে, কিছু অন্ধ, কিছু বধির এবং কিছু নু লা ও ল্যাংড়া ব্যক্তিদের একত্রিত করে আর তাদেরকে বিতর্কের পূর্বে একপাশে বসিয়ে দেয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আগমন করতেই তৎক্ষণাৎ তারা সেই অন্ধ, বধির ও নুলা-ল্যাংড়া ব্যক্তিদের তাঁর (আ.) সামনে উপস্থাপন করে বলে যে, (শুধু) কথায় বিরোধের নিষ্পত্তি হবে না। আপনি বলে থাকেন যে, আমি মসীহ্ নাসেরীর মসীল বা প্রতিচ্ছবি আর মসীহ্ নাসেরী অন্ধদের দৃষ্টিশক্তি প্রদান করতেন, বধিরদের শ্রবণশক্তি ফিরিয়ে দিতেন এবং পঙ্গুদের হাত-পা ভালো করে দিতেন। মসীহ্ নাসেরী তো এসব কাজ করতেন, আমরা আপনাকে কষ্ট থেকে রক্ষা করার জন্য এখানে কতক অন্ধ, বধির এবং নুলা ও খোঁড়াদের একত্রিত করেছি। আপনি যদি সত্যিই মসীহ্র মসীল বা প্রতিচ্ছবি হয়ে থাকেন তাহলে এদেরকে সুস্থ করে দেখান। খলীফা আউয়াল(রা.) বলতেন, আমরা সেখানে বসা ছিলাম। তাদের একথা শুনে আমরা হতোদ্যম পয়ে পড়ি। যদিও আমরা জানতাম যে, এগুলো কেবলই মনগড়া কথা, অর্থাৎ মসীহ্ নাসেরীর প্রতি যেসবকথা আরোপ করা হয় তাতে কোন সত্যতা নেই, তবুও আমরা হতোদ্যম হয়ে যাই। আমরাএকারণে ঘাবড়ে যাই যে, আজ তারা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করার সুযোগ পেয়ে যাবে, কিন্তু আমরা যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর চেহারার প্রতি তাকাই তখন দেখি যে, তঁার চেহারায় অপছন্দকিংবা অস্বস্তির কোন ছাপ নেই। তাদের কথা শেষ হলে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, দেখুন পাদ্রী সাহেব! আমি যে মসীহ্র মসীল বা প্রতিচ্ছবি হবার দাবি করছি ইসলামী শিক্ষানুযায়ী তিনি এরূপ অন্ধ, বধির এবং নুলা-ল্যাংড়াদের সুস্থ করতেন না, কিন্তু আপনাদের বিশ্বাস হলো, মসীহ্ দৈহিক দিক থেকে অন্ধ, বধির এবং পঙ্গুদের সুস্থ করতেন। এছাড়া আপনাদের কিতাবে এটিও লেখা আছে যে, তোমাদের মাঝে যদি বিন্দু পরিমাণ ঈমান থাকে আর তোমরা পাহাড়কে একস্থান থেকে আরেকস্থানে সরে যেতে বল তবে তা সরে যাবে এবং তোমরা যদি অসুস্থদের গায়ে হাত রাখ তবে তারা সুস্থ হয়ে যাবে। সুতরাং আমার কাছে এই দাবি করা যেতে পারে না। আমি তো সেসব মু'জিযা দেখাতে পারি যা আমার মনিব হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) দেখিয়েছেন। আপনারা সেসকল মু'জিযা দেখানোর দাবি জানালে আমি তা দেখাতে প্রস্তুত আছি। বাকি রইল এ ধরনের মু'জিযা, সেক্ষেত্রে আপনাদের কিতাবে বলা আছে যে, প্রত্যেক সেই খ্রিষ্টান, যার মাঝে এক সরিষা পরিমাণ ঈমান রয়েছে, সে অনুরূপ মু'জিযা দেখাতে সক্ষম যেরূপ হযরত মসীহ্ নাসেরী দেখিয়েছেন। তাই আপনি খুব ভালো কথা বলেছেন যে, আমাদের কষ্ট করা থেকে বাঁচিয়েছেন এবং এই অন্ধ, বধির এবং পঙ্গুদের একত্রিত করেছেন। এখন এই অন্ধ, বধির এবং নুলা ও খোঁড়ারা উপস্থিত আছে, আপনাদের মাঝে যদি এক সরিষা পরিমাণ ঈমান থাকে তবে এদেরকে সুস্থ করে দেখিয়ে দিন। হযরত খলীফা আউয়াল (রা.) বলতেন, আমরা দেখেছি যে, এই উত্তরে পাদ্রীদের এমন অবস্থা হয়েছে যে, বড় বড় পাদ্রীরা সেসব পঙ্গুদের টেনে টেনে (সেখান থেকে) সরিয়ে নিচ্ছিল। অতএব আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নৈকট্যপ্রাপ্তদেরকে সকল ক্ষেত্রে সম্মান প্রদান করেন এবং তাঁদেরকে এমন এমন উত্তর শিখান যার ফলে শত্রুরা সম্পূর্ণ হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে।

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-২৩, পৃ: ৮৮-৮৯)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরোধিতা সম্পর্কিত শিয়ালকোটের একটি ঘটনা তিনি (রা.) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) শিয়ালকোট গমন করলে মৌলবিরা ফতোয়া দেয় যে, তাঁর (আ.) বক্তৃতা শুনতে যারা যাবে তাদের বিয়ে ভেঙে যাবে, কিন্তু হযরত মির্যা সাহেবের (বক্তব্যের) আকর্ষণ এমন ছিল যে, মানুষ এই ফতোয়ারও কোন পরোয়া করে নি। তখন মৌলবিরা রাস্তায় প্রহরা বসায় যাতে মানুষকে যেতে বাধা দিতেপারে এবং রাস্তায় পাথর জমিয়ে রাখে যে, যারা এরপরও থামবে না তাদেরকে পাথর মারা হবে। এছাড়া তারা মাহফিল থেকে মানু ষকে ধরে ধরে নিয়ে যেত যাতে মানুষ বক্তৃতা শুনতে না পারে। তিনি (রা.) বলেন, তখন বি.টি. সাহেব নামের একজন ছিলেন যিনি তৎকালে শিয়ালকোটের সিটি ইন্সপেক্টর ছিলেন আর পরবর্তীতে পুলিশের সুপারিনটেনডেন্ট হয়েছিলেন। বর্তমানে তার পদবী কি তা জানা নেই, অর্থাৎ যখন এটি বর্ণনা করা হচ্ছিল (তখনকার কথা)। ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন সেই বি.টি সাহেব। মানুষ যখন হৈ চৈ আরম্ভ করে এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চায় তখন হযরত সাহেবের বক্তৃতা যেহেতু তিনিও শুনেছিলেন তাই তিনি অবাক হন যে, এই বক্তৃতায় তো আর্যসমাজী এবং খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে কথা বলা হয়েছে আর মির্যা সাহেব যাকিছু বলেছেন তা যদি মৌলবিদের চিন্তাধারার বিপরীতও হয় তবুও এতে ইসলামের ওপর কোন আপত্তি উত্থাপিত হয় না। এখানে তো খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে বক্তব্য দেওয়া হচ্ছে। আর উক্ত বক্তব্য যদি সত্য হয় তাহলে তাতে ইসলামের সত্যতা সাব্যস্ত হয়। [মির্যা সাহেব যা বলছেন তা যদি সত্য হয়, তাহলে তো ইসলামের সত্যতা সাব্যস্ত হয়।] তাহলে মুসলমানদের দাঙ্গা-ফ্যাসাদ করার কারণ কী? যদিও তিনি সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন তবুও তিনি জলসার মাঝে দাঁড়িয়ে যান এবং বলতে থাকেন, ইনি তো বলছেন যে, খ্রিষ্টানদের ঈশ্বর মারা গেছেন। তিনি মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলেন, হে মুসলমানেরা! তোমরা কেন এতে ক্রোধান্বিত হচ্ছ? [তিনি তো এ কথাই বলছেন যে, খ্রি ষ্টানদের ঈশ্বর মারা গেছেন; এতে তোমাদের ক্রোধান্বিত হওয়ার কী আছে? এ তো তোমাদের জন্য সুখবর!]

মোটকথা তারা আমাদের সাথে এমনই ব্যবহার করে থাকে; [অর্থাৎ বিরুদ্ধবাদীরা।] আর বাহ্যত এটিই দেখা যায় যে, যদি এদের মাঝ থেকে মানুষ আর্যদের দলেও চলে যায়, তাতে আমাদের কী যায় আসে! [অর্থাৎ মুসলমানদের মাঝে কেউ যদি আর্যদের দলেও যোগ দেয়, তাতে মুসলমানদের কিছু যায় আসে না। কিন্তু মির্যা সাহেবের কথা কেউ যেন না শোনে!] তিনি (রা.) বলেন, প্রকৃত বিষয় হলো, এরূপ চিন্তাধারা ভুল। [কোন মুসলমান যদি ধর্ম পরিবর্তন করে তবে আমাদের যায়-আসে।] তিনি (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন,

اے دل تُو نیز خاطر اِیناں نِگاہ دار کآخر کنند دعویٔ حُبِّ پیمبرم অর্থাৎ, হে আমার হৃদয়! তুমি এদের খেয়াল রেখো; কেননা আর যা-ই হোক, এরা আমার নবী (সা.)-কে ভালোবাসার দাবি তো করে! (-ফার্সী পঙ্ক্তির অনুবাদ)এই কারণে তাদের ধর্মান্তরিত হওয়াতে অথবা পথভ্রষ্ট হওয়াতে আমাদের হৃদয় অবশ্যই ব্যথিত হয়।

(তারিখ শুদ্ধি মালকানা, আনোয়ারুল উলুম, ৭ম খণ্ড, পৃ: ১৯২)

একদা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে এক ব্যক্তি বলে যে, আমি আপনাকে অনেক শ্রদ্ধা করি। কিন্তু আপনার দ্বারা অনেক বড় একটি ভুল হয়ে গেছে। আপনার জানা আছে, আলেমরা কারো কথা মানে না। কেননা তারা জানে যে, কথা মেনে নিলে তা আমাদের জন্য অপমানজনক হবে; মানুষ বলবে, এ বিষয়টি অমুক বুঝেছে, কিন্তু এরা (তথা মৌলবিরা) বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে। তাই তাদেরকে স্বীকার করানোর উপায় হলো, তাদের মুখ দিয়েই যেন কথা বের করা হয়। আপনি যখন ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর বিষয়টি অবগত হন, তখন আপনার উচিত ছিল, আপনি শীর্ষস্থানীয় আলেমদের নিমন্ত্রণ করতেন আর একটি মিটিং করে এ বিষয়টি তাদের সম্মুখে উপস্থাপন করতেন যে, ঈসা (আ.)-এর জীবিত থাকার বিশ্বাসের মাধ্যমে খ্রিষ্টানদের অনেক সুবিধা হয় এবং তারা আপত্তি উত্থাপনের মাধ্যমে ইসলামের ক্ষতি করছে। তারা বলে, তোমাদের নবী মৃত্যুবরণ করেছে আর আমাদের ধর্মের প্রবক্তা আকাশে আছেন, তাই তিনি শ্রেষ্ঠ; বরং তিনি স্বয়ং ঈশ্বর- এর প্রত্যুত্তর দেওয়া প্রয়োজন। যদি আপনি এই প্রশ্ন করতেন, তখন আপনার নিমন্ত্রণে আগত সেই আলেমরা একথাই বলতো যে, আপনিই বলুন; [অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে বলতো যে, আপনিই বলুন- এর কী উত্তর হতে পারে?] তখন আপনি বলতে পারতেন, সিদ্ধান্ত তো আসলে আপনাদেরটাই সঠিক হওয়া সম্ভব; তবে আমার মতে অমুক আয়াত দ্বারা হযরত মসীহ্‌র মৃত্যু সাব্যস্ত হতে পারে। আলেমরা তাৎক্ষণিকভাবে বলতো, আপনার এ কথা সঠিক। বিসমিল্লাহ্ বলে আপনি ঘোষণা দিন; আমরা আপনাকে সমর্থন দিতে প্রস্তুত। মৌলবিদের স্বীকার করানোর জন্য সেই ব্যক্তি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে এই পদ্ধতি বলেন। তিনি আরও বলেন, এভাবে এই বিষয়টিও উত্থাপিত হতো যে, হাদীসে হযরত মসীহ্ (আ.)-এর পুনরাগমনের উল্লেখ আছে। কিন্তু মসীহ্ (আ.) যেহেতু মৃত্যু বরণ করেছেন, সেক্ষেত্রে ঐসকল হাদীসের কী অর্থ হবে? তখন কোন আলেম আপনাকে বলতো, আপনিই মসীহ্! আর সকল আলেম-ওলামা এ বিষয়ে সত্যায়নের সীল লাগিয়ে দিত। এই প্রস্তাব শুনে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

আমার দাবি যদি মানবীয় চালাকি-প্রসূত হতো, তাহলে নিঃসন্দেহে আমি এমনটিই করতাম। কিন্তু এটি ঘটেছে খোদা তা'লার নির্দেশে। খোদা তা'লা যেভাবে বুঝিয়েছেন আমি ঠিক সেভাবেই করেছি।

বস্তুত চালাকি ও প্রতারণা মানবীয় কূটচক্রের মোকাবিলায় হয়ে থাকে, ঐশী জামা'ত কখনোএগুলোকে ভয় করে না। এ কাজ আমাদের নয়; বরং এটি খোদা তা'লার কাজ। তিনিই এই বাণীকে ছড়িয়ে দেবেন।

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-১২, পৃ: ১৯৬-১৯৭)

চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের ঘটনা আমাদের জামা'তের প্রসিদ্ধ ঘটনা। এ ঘটনা সম্পর্কেও জনৈক বিরুদ্ধবাদী মৌলবি, যে সম্ভবত গুজরাতের বাসিন্দা ছিল, সে সবসময় মানুষকে বলতো, মির্যা সাহেবের দাবি শুনে কোনভাবেই বিভ্রান্ত হয়ো না। হাদীসসমূহে স্পষ্টভা বে লিপিবদ্ধ আছে, ইমাম মাহদীর লক্ষণ হলো- তাঁর যুগে রমজান মাসে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ না হয়, আর যতক্ষণ পর্যন্ত রমজান মাসে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ সংঘটিত না হয়- ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর দাবিকে সত্য মনে করো না। ঘটনাক্রমে তার জীবদ্দশাতেই চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়ে যায়। তার একজন আহমদী প্রতিবেশী ছিল। তিনি বর্ণনা করেন যে, যখন সূর্যগ্রহণ আরম্ভ হয় তখন সেই মৌলবি বিচলিত অবস্থায় নিজ বাড়ির ছাদে উঠে পায়চারি করতে থাকে। সে পায়চারি করছিল আর বলছিল - 'হুন লোগ গুমরাহ্ হোঙ্গে, হুন লোগ গুমরাহ্ হোঙ্গে'; [বারংবার একথা বলছিল;] অর্থাৎ 'এখন মানুষ পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে!' সে এটি বুঝতে পারে নি যে, ভবিষ্যদ্বাণী যেহেতু পূর্ণ হয়েছে, তাই মানুষ মির্যা সাহেবকে মান্য করে হেদায়েত লাভ করবে; পথভ্রষ্ট হবে না। খ্রি ষ্টানরাও একদিকে স্বীকার করতো যে, প্রাচীন ধর্মগ্রন্থসমূহে বর্ণিত যাবতীয় লক্ষণাবলী পূর্ণ হয়েছে; কিন্তু অন্যদিকে মহানবী (সা.)-এর দাবি শুনে এই কথাও বলতো যে, দৈবক্রমে এখন একজন মিথ্যাবাদীও দাবি করে বসেছে। যেভাবে মুসলমানরা বলে, লক্ষণাবলী পূর্ণ হয়েছে, কিন্তু ঘটনাচক্রে এখন একজন মিথ্যাবাদী দাবি করে বসেছে। এই হলো মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা! কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, এমন কাকতাল একজন মিথ্যাবাদীর কপালে জোটে, অথচ সত্যবাদীর কপালে জোটে না! (তফসীর কবীর, ১০ম খণ্ড, পৃ: ৫৬)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অতীত জীবন সম্পর্কে তিনি (রা.) বলেন, প্রত্যেক পাপ পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি হয়। কখনো এমনটি ঘটে না যে, এক ব্যক্তি রাতের বেলা সত্যবাদী অবস্থায় ঘুমোয় আর পরদিন ভোরে উঠে জঘন্যতম মিথ্যাবাদীতে পরিণত হয়; অতীতে সে মানুষের ব্যাপারেও মিথ্যাচার করতো না, অথচ এখন ঘুম থেকে উঠেই খোদা তা'লা সম্পর্কে মিথ্যাচার করা আরম্ভ করে দেয়! এই নীতি অনুসারে আমরা হযরত মির্যা সাহেবের দাবির পূর্ববর্তী জীবনের দিকে দৃষ্টি দিই। তিনি (আ.) এখানকার হিন্দু সম্প্রদায়, শিখ মতাবলম্বী ও মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বারংবার ঘোষণা দিয়েছেন যে, তোমরা কি আমার (দাবির) পূর্ববর্তী জীবনাচরণের ওপর কোন আপত্তি করতে পারবে? অথচ কারোরই এই স্পর্ধা হয় নি, উল্টো তাঁর (আ.) নিষ্কলুষ চরিত্রের স্বীকারোক্তি দিতে হয়েছে। মৌলবি মুহাম্মদ হুসেন বাটালভি, যিনি পরবর্তীতে ঘোর বিরোধীতে পরিণত হন, তিনি নিজের পত্রিকায় তাঁর (আ.) জীবনের পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতার সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। আর জনাব জাফর আলী খানের পিতা নিজ পত্রিকায় তাঁর (আ.) প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, তিনি (আ.) অত্যন্ত পবিত্রচেতা ব্যক্তি ছিলেন। অতএব যে ব্যক্তি চল্লিশ বছর পর্যন্ত নিষ্কলুষ ও পবিত্র জীবন যাপন করেছেন, তিনি রাতারাতি কীভাবে ভিন্ন কিছু হয়ে গেলেন এবং বদলে গেলেন? মনোবিজ্ঞানীদের অভিমত হলো, [অর্থাৎ সাইকোলজিস্টরাও বলেন,] যাবতীয় মন্দকর্ম ও চারিত্রিক ত্রুটি ধীরে ধীরে সৃষ্টি হয়; এক নিমিষেই চারিত্রিক পরিবর্তন সাধিত হয় না। অতএব লক্ষ্য করুন! তাঁর (আ.) অতীত জীবন কতটা নিষ্কলুষ, ত্রুটিহীন ও আলোকোদ্ভাসিত ছিল।"

(মেয়ারে সাদাকাত, আনোয়ারুল উলুম, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৬০-৬১)

আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে কীভাবে সাহায্য করে গিয়েছেন- এ সম্পর্কে আমরা লক্ষ্য করি যে, তিনি লিখেন, যিনি খোদা তা'লা কর্তৃক প্রেরিত হয়ে থাকেন, তাঁর সাথে ঐশী সাহায্য-সমর্থন থাকে। যদি ঐশী সাহায্য-সমর্থন না থাকে, তবে সে খোদার প্রেরিত বা রসুল নয়।

মানুষ তাকে ধ্বংস করে ফেলার উপক্রম করে, কিন্তু ঐশী সাহায্য এগিয়ে আসে ও তাঁকে সাফল্যমণ্ডিত করে এবং তাঁর শত্রুদের যাবতীয় চক্রান্ত ধূলিসাৎ

করে দেয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে। তাঁকে বিভিন্নভাবে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে; হত্যার জন্য ঘাতক নিযুক্ত করা হয়েছে, যাদের কথা জানাজানি হয়ে যায় ও তারা নিজেদের ষড়যন্ত্রে ব্যর্থ হয়। তঁ ার (আ.) বিরুদ্ধে হত্যাচেষ্টার মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়। বস্তুত মার্টিন ক্লার্ক তঁ ার (আ.) বিরুদ্ধে হত্যার মিথ্যা মামলা সাজায় আর এক ব্যক্তি সাক্ষ্যও দেয় যে, আমাকে হযরত মির্যা সাহেব (হত্যাকাণ্ডের জন্য) নিযুক্ত করেছিলেন। সেই ম্যাজিস্ট্রেট, যে ঘোষণা দিয়ে বলেছিল যে, এই মসীহ্ ও মাহ্দী হবার দাবিকারককে আজ পর্যন্ত কেউ ধরে নি কেন? আমি তাকে ধরব! কিন্তু যখন মামলা হয়, তখন সেই ম্যাজিস্ট্রেটই বলে, আমার বিবেচনায় এটি মিথ্যা মামলা। বারবার সে একথাই বলেছে আর অবশেষে সেই ব্যক্তিকে খ্রিষ্টানদের কাছ থেকে পৃথক করে পুলিশ কর্মকর্তার হেফাজতে রাখা হলে সে কান্না শুরু করে আর বলে দেয় যে, খ্রিষ্টানরা আমাকে (মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে) শিখিয়ে দিয়েছিল। এভাবে খোদা তা'লা সেই মিথ্যা অভিযোগকে নস্যাৎ করে দেন।

অনুরূপভাবে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন, আমাদের জামা'তের একজন অত্যন্ত উদ্যমী মু বাল্লেগ হলেন শিমলা-নিবাসী মৌলবি উমর উদ্দীন সাহেব। তিনি নিজের (বয়আত করার) ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, তিনিও এই মানদণ্ড যাচাই করে আহমদী হয়েছিলেন। তিনি বলেন, শিমলায় মৌলবি মুহাম্মদ হুসেন ও মৌলবি আব্দুর রহমান সাইয়্যাহ্ এবং আরও কতিপয় ব্যক্তি শলা-পরামর্শ করছিল যে, এখন মির্যা সাহেবের বিরুদ্ধে কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করা যায়? মৌলবি আব্দুর রহমান সাহেব বলেন, মির্যা সাহেব ঘোষণা দিয়েছেন যে, আমি আর মুবাহেসা করব না। এখন আমরা মুবাহেসার বিজ্ঞাপন দিই; তিনি যদি এর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দণ্ডায়মান হন তবে আমরা বলব, তিনি মিথ্যা বলেছেন; ইতিপূর্বে তিনি বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন যে, আমি কারো সাথে মুবাহেসা করব না, অথচ এখন মুবাহেসা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছেন! আর যদি তিনি মুবাহেসা করতে এগিয়ে না আসেন, তখন আমরা চিৎকারচেঁচামেচি করব যে, দেখ, মির্যা সাহেব পরাজিত হয়েছেন! একথা শুনে মৌলবি উমর উদ্দীন সাহেব বলেন, এসবের কী দরকার আছে! আমি যাচ্ছি আর গিয়ে তাকে হত্যা করে এই ঝামেলা একেবারে শেষ করে দিচ্ছি। মৌলবি মুহাম্মদ হুসেন সাহেব বলেন, হে ছেলে! তুমি তো জানো না, এসব (চেষ্টা) আগেই করা হয়ে গিয়েছে। মৌলবি উমর উদ্দীন সাহেবের হৃদয়ে এই বিষয়টি দাগ কাটে যে, খোদা যে ব্যক্তির এতটা নিরাপত্তা বিধান করছেন, তিনি (নিশ্চয়) খোদার পক্ষ থেকেই হবেন।

তিনি যদিও তরুণ ছিলেন, তবুও তিনি বুঝতে পারেন - আল্লাহ্ তা'লা (তাঁর) এতটা নিরাপত্তা বিধান করছেন যে এত ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও তিনি নিরাপদ রয়েছেন, তাহলে তিনি খোদার পক্ষ থেকেই হয়ে থাকবেন। অতঃপর তিনি বয়আত করে ফেরত যাবার সময় স্টেশনে মৌলবি মুহাম্মদ হুসেন বাটালভী সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তুমি কোথা থেকে? উত্তরে তিনি বলেন, কাদিয়ান থেকে বয়আত করে এসেছি। মৌলবি মুহাম্মদ হুসেন সাহেব বলেন, তুমি তো খুবই দুষ্ট! তোমার বাবার কাছে লিখব! তিনি উত্তরে বলেন, মৌলবি সাহেব! যা কিছু হয়েছে সব আপনার কারণেই হয়েছে। অতএব বিরুদ্ধবাদীরা আল্লাহ্ তা'লার প্রিয়দের হত্যা করতে চায়, তা সত্ত্বেও তাদেরকে রক্ষা করা হয়। খোদা তাদেরকে নিত্যনতুন জ্ঞানের মাধ্যমে সাহায্য করেন এবং সকল ক্ষেত্রে তাদেরকে সম্মানিত করেন।

(মেয়ারে সাদাকাত, আনোয়ারুল উলুম, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৬১-৬২)

অনুরূপভাবে, মৌলবি মুহাম্মদ হুসেন বাটালভী সাহেবের এই দাবিও ছিল যে, আমি মির্যা সাহেবকে ধ্বংস করে দিব।

"মৌলবি মুহাম্মদ হুসেন বাটালভী সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যৌবনের বন্ধু ছিলেন এবং তাঁর সাথে সু -সম্পর্ক রাখতেন ও সর্বদা তঁ ার (আ.) রচনার প্রশংসা করতেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবির সাথে সাথেই তিনি ঘোষণা দেন যে, আমিই এই ব্যক্তিকে উঠিয়েছিলাম, আর এখন আমিই তাকে ধ্বংস করে দেব। আবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আত্মীয়-স্বজনরাও ঘোষণা দেয়, বরং কতিপয় সংবাদপত্রে এই ঘোষণা ছাপিয়েও দেয় যে, এই ব্যক্তি ব্যবসা খুলে বসেছে, তাই তার প্রতি কারো মনোযোগ দেয়া উচিত নয়। আর এভাবে তারা পুরো পৃথিবীতে তাঁর (আ.) বিষয়ে মন্দ ধারণা সৃষ্টির চেষ্টা করে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এটি আমার বোধশক্তি হওয়ার পরের কথা; অনেক কাজের লোকই, চাষাবাদের কাজকর্মে যাদেরকে 'কাম্মি' বলা হয়, তারা তাঁর (আ.) বাড়ির কাজ করতে অস্বীকৃতি জানায়। [অর্থাৎ যাদেরকে কামলা বলা হতো, চাষাবাদের অঞ্চল হওয়া সত্ত্বেও, এলাকার স্বীকৃত কৃষিজীবি হওয়া সত্ত্বেও তারা তাঁর (আ.) বাড়ির কাজ করতে অস্বীকৃতি জানায়।] এর পেছনে উস্কানিদাতা আসলে আমাদের আত্মীয়-স্বজনরাই ছিল। মোটকথা, আপন-পর সবাই মিলে তাঁকে (আ.) নিশ্চিহ্ন ও ধ্বংস করে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু খোদা তাঁর বান্দাকে বলেন, পৃথিবীতে একজন নবী এসেছে, কিন্তু পৃথিবী তাকে গ্রহণ করে নি, তবে খোদা তাকে গ্রহণ করবেন এবং উপর্যুপরি প্রবল আক্রমণসমূহ দ্বারা তার সত্যতা প্রকাশ করে দিবেন।"

এক নিঃস্ব ও অসহায় ব্যক্তি কাদিয়ানের মতো গণ্ডগ্রামে, যেখানে সপ্তাহে মাত্র একবার ডাক আসতো, যেখানে একটা প্রাইমারি স্কুল পর্যন্ত ছিল না, যেখানে এক রূপির আটাও মানুষ পেতো না- সেখানে দণ্ডায়মান হন; আর সেই মানুষটিও এমন মানুষ যিনি কোন মৌলবিও না, কিংবা অনেক সহায়-সম্পত্তির মালিকও না; নিঃসন্দেহে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক সম্ভ্রান্ত বংশের মানুষ ছিলেন, কিন্তু রাজা ও নবাবদের মতো বিরাট সহায়-সম্পত্তির মালিক ছিলেন না; তিনি দাঁড়িয়ে জগতের সামনে ঘোষণা করেন এবং প্রথম দিনই বলে দেন যে, খোদা আমার নাম পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দিবেন; আর আজ কে একথা বলতে পারে যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নাম পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে যায় নি?"

(খুতবাতে মাহমুদ, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩২৪-৩২৫)

আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি, পৃথিবীর এমন কোন প্রান্ত নেই যেখানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) স্বনামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন নি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, মিথ্যাবাদীর ধ্বংস হওয়ার জন্য তার মিথ্যাচারই যথেষ্ট। কিন্তু যে কাজ আল্লাহ্ তা'লার প্রতাপ এবং তাঁর রসূলের আশিসরাজির প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে হয়ে থাকে এবং তা স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লার হাতে রোপিত চারা হয়ে থাকে, সেটির সুরক্ষা তো খোদ ফিরিশতারা করে থাকেন। কার সাধ্য আছে যে, সেটিকে ধ্বংস করবে? মনে রেখো, আমার জামা'ত প্রতিষ্ঠা যদি নিছক ব্যবসা হয়ে থাকে, [যেভাবে তারা বলতো যে এটি ব্যবসা;] তবে এর নাম-নিশানাও থাকবে না। কিন্তু যদি এটি খোদার পক্ষ থেকে হয়ে থাকে এবং নিঃসন্দেহে এটি তাঁরই পক্ষ থেকে, তাহলে সারা পৃথিবীও যদি এর বিরোধিতা করে তবুও এটি বৃদ্ধি পাবে ও বিস্তৃত হবে এবং ফিরিশতারা এর সুরক্ষা বিধান করবে, [ইনশাআল্লাহ্]। যদি একজনও আমার সাথে না থাকে এবং কেউ-ই সাহায্য না করে, তবুও আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি, এই জামা'ত সফল হবে, ইনশাআল্লাহ্।"

(মালফুযাত, ৮ম খণ্ড, পৃ: ১৪৮)

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সামর্থ্য দিন, আমরা যেন তাঁর (আ.) হাতে বয়আত করার কর্তব্য পালনকারী হই এবং তাঁর বাণীকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়ে আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ও পুরস্কাররাজির উত্তরাধিকারী হই; অবিশ্বস্তদের দলভুক্ত না হই, বরং বিশ্বস্তদের মধ্যে পরিগণিত হই। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সেই সৌভাগ্য দান করুন।

আজ আমি একটি ওয়েবসাইটও উদ্বোধন করব বা এর ঘোষণা করব। এটিও তবলীগের, পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বাণী পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যম। এটি কুর্দি ভাষায় জামা'তের ওয়েবসাইট- islamahmadiyya.krd। এই ওয়েবসাইটের তত্ত্বাবধান করছেন ডা. ইসমাঈল মুহাম্মদ সাহেব, তার সাথে কুর্দি জামা'তের সদস্যদের একটি দলও রয়েছে। এই ওয়েবসাইটের উদ্দেশ্য হলো কুর্দি ভাষাভাষী পাঠকরা যেন প্রথমবারের মতো নিজেরা আহমদীয়া জামা'তের বিশ্বাস সম্পর্কে নিজেদের ভাষায় পড়তে পারে- সেই সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া। এই ওয়েবসাইট মূলত কুর্দি ভাষার 'সোরানী' উপভাষায় বানানো হয়েছে, সেইসাথে 'বাদিনী' উপভাষায়ও কিছু বিষয়বস্তু রয়েছে। ওয়েবসাইটটিতে সংবাদ, প্রবন্ধ, তফসীর, বইপুস্তক, জুমুআর খুতবা ও ভিডিও বিভাগ রয়েছে। কুর্দি অনুবাদ কমিটির সহযোগিতায় এই ওয়েবসাইটে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বেশ কিছু সংখ্যক বইসহ অন্যান্য জামা'তী বইপুস্তকও রয়েছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বই রয়েছে, হযরত খলীফা সানীর বই রয়েছে এবং অন্যান্য জামা'তী রচনাবলী রয়েছে, যার মধ্যে ইসলামী নীতিদর্শন, মসীহ্ হিন্দুস্তান মেঁ, জরুরতুল ইমাম, হাকীকাতুল মাহদী, দাওয়াতুল আমীর, মানসবে খিলাফত প্রভৃতি রয়েছে। ইনশাআল্লাহ্ তা'লা জুমুআর নামাযের পর এই ওয়েবসাইটের উদ্বোধনও হবে। আল্লাহ্ তা'লা একে কল্যাণমণ্ডিত করুন।

একইভাবে

পৃথিবীতে যে পরিস্থিতি বিরাজমান, সেই বিষয়েও বলতে চাই- দোয়া অব্যাহত রাখুন। আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করুন এবং মানুষকে সুবুদ্ধি দিন, আর তারা যেন নিজেদের স্রষ্টাকে চিনতে সক্ষম হয়।

****

যুগ খলীফার বাণী

খিলাফত ব্যবস্থাপনা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিধান ও ব্যবস্থাপনারই একটি অঙ্গ।

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত ২৪ শে মে, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Mohmmad Parvez Hossain and Family, Bolpur, (Birbhum)

২০১৩ (সেপ্টেম্বর) সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর নিউজিল্যাণ্ড সফর

(সমাপনী ভাষণের শেষাংশ, পূর্বের সংখ্যা ১৫-এর পর)

হুযুর আনোয়ার বলেন: মানবতার সেবার কাজ নিজ পরিবার থেকে আরম্ভ হওয়া উচিত আর এর পরবর্তী বিস্তার হবে প্রতিবেশী পর্যন্ত। অতঃপর জাতীয় স্তর পোঁছনোর পর তা আন্তর্জাতিক স্তর পর্যন্ত পোঁছে যাওয়া উচিত। একজন সত্যিকার মুসলমানের উচিত অন্যদেরকেও পুণ্য কাজে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করা এবং তাদেরকে পাপ থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করা। একজন আহমদী তখনই প্রকৃত আহমদী তথা প্রকৃত মুসলমান হিসেবে পরিচিত হবে যখন সে এই সব শিক্ষা মেনে চলবে। আর তা সম্ভব তখন হবে যখন সে খোদা তা'লার উপর সত্যিকার ঈমান আনয়নকারী হবে। তাই যদি এমনটি হয় যে, জলসার এই তিনটি দিনেই পুণ্য কর্ম করেন তবে আপনাদের কোনও উপকারে আসবে না। প্রত্যাশা হল, প্রতিটি মুহূর্ত এই বিষয়টি সামনে রাখবেন যে, আমরা আহমদী মুসলমানরা খোদা তা'লার জামাতের অংশ আর আমাদের জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মানবতার সেবা এবং কল্যাণার্থে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমরা সেই জামাত যাকে সর্বাবস্থায় পৃথিবীতে পুণ্যের প্রসার ঘটাতে হবে।আমরা সেই জামাত যাদেরকে সর্বাবস্থায় পাপ ও অসাধুতা বর্জন করতে হবে। এই মহান কাজ ততক্ষণ সম্ভব নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা ঈমানের বিষয়ে পরিণত হই আর আমরা সকলে নিজেদের যাবতীয় শক্তি ও সামর্থকে কাজে লাগিয়ে আল্লাহ্ তা'লার আদেশাবলী শিরোধার্য করি। আমরা অন্যদেরকে পুণ্য ও সৎপথের দিকে আহ্বান করতে পারব, যখন আমরা নিজেরাও পুণ্যবান হব। আমরা অন্যদেরকে অসৎকর্ম ত্যাগ করতে উদ্বুদ্ধ করতে পারব, যখন আমরা নিজেরাও যাবতীয় অসৎকর্ম পরিহার করব। অতএব, সর্বপ্রথম প্রত্যেক আহমদীকে নিজের অভ্যন্তরকে পবিত্র করার চেষ্টা করতে হবে। প্রত্যেক আহমদীর উচিত সম্পূর্ণ সৎ মানুষের পরিণত হওয়া এবং উচ্চ নৈতিক মান অর্জন করার চেষ্টা করা। প্রত্যেক আহমদীর উচিত আত্মমন্থনের মাধ্যমে যাবতীয় প্রকারের অসৎকর্ম থেকে দূরে থাকা।

হুযুর আনোয়ার বলেন: মনে রাখবেন, আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে বলেছেন, প্রত্যেক সত্যিকার মোমেনের লক্ষ্য হওয়া উচিত পুণ্যে কর্মে একে অপরের থেকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা। সূরা বাকারার ১৪৯ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন-

এবং প্রত্যেকের জন্যই কোন না কোন লক্ষ্যস্থল রহিয়াছে যাহার প্রতি সে (সমস্ত) মনোযোগ নিবদ্ধ রাখে। সুতরাং (তোমাদের লক্ষ্যস্থল এই যে) তোমরা পুণ্য অর্জনে পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা কর। তোমরা যেখানেই থাক না কেন, আল্লাহ্ তোমাদের সকলকে একত্রিত করিয়া আনিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান।

যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা এই উচ্চ মান অর্জন করি, ততক্ষণ পর্যন্ত এমন একটি জামাত হিসেবে পরিচয় দেওয়ার যোগ্য হব না যাদের উদ্দেশ্য জগতের কল্যাণ এবং সমগ্র মানবজাতিকে আধ্যাত্মিক পুণ্যের দিকে আহ্বনা করা এবং যাবতীয় অসৎ কর্ম থেকে বিরত রাখা।

হুযুর আনোয়ার বলেন: দেখুন, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে কতই না সুন্দর শিক্ষামালা দান করেছেন যার মাধ্যমে তিনি আমাদেরকে আধ্যাত্মিক, ধর্মীয়, জাগতিক ও জাতিগত উন্নতির পথ দেখিয়েছেন। বস্তুত এটিই সফলতার চাবিকাঠি। আমরা যদি এর উপর আমল করি তবে আমাদের নিজেদের মধ্যেই এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়ন করতে পারি। যদি পুণ্যের ক্ষেত্রে একে অপরের থেকে এগিয়ে যাওয়ার বিষয়ে সত্যিকার অর্থে বাস্তবায়ন হয়, তবে আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুসারে মানুষ খোদা তা'লার পুরস্কার ও কৃপারাজি পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এই বিষয়টিকে আরও বিশদে ব্যাখ্যা করার জন্য বলা উচিত যে, পুণ্যেকর্মের পরস্পর প্রতিযোগিতার দাবি হল মানুষ খোদা তা'লার বিধিনিষেধ মেনে চলবে। আল্লাহ্ তা'লা নির্দেশিত প্রধান প্রধান আদেশগুলির মধ্যে নিঃসন্দেহে অন্যতম প্রধানটি হল মানুষ সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য অর্থাৎ মানুষ যেন সেই খোদা তা'লার ইবাদত করে যেভাবে তিনি স্বয়ং ইবাদত করার পদ্ধতি বলে দিয়েছেন। তাই সর্বশক্তিমান খোদা যে পদ্ধতিতে ইবাদত করার কথা বলেছেন অবশ্যই সেই পদ্ধতি অবলম্বন করা প্রত্যেক আহমদীর কর্তব্য।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমি জামাতকে ধারাবাহিকভাবে নিজের খুতবা এবং বক্তৃতায় এ বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকি। গত জুমআর খুতবাতেও আমি এবিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। আমরা যদি সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ এই উদ্দেশ্যটিকে ভুলে যাই বা উপেক্ষা করি আর আল্লাহ্ তা'লা নির্দেশিত পন্থা অনুসারে তাঁর ইবাদত না করি, তবে আমরা খোদা তা'লার সেই মহান নেয়ামতকে অস্বীকারকারী হব যা তিনি হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.)-এর বয়আতের মাধ্যমে আমাদের দান করেছেন। সেই আদেশ প্রত্যাখ্যান করলে আমরা খোদা তা'লা নির্দেশিত 'পুণ্যকর্মে পরস্পর প্রতিযোগিতা করা'-র কৃপা থেকেও বঞ্চিত হব।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: এই যুগে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) সেই পুণ্যময় উদ্দেশ্যকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতে আবির্ভূত হয়েছেন যা আঁ হযরত (সা.) বর্ণনা করেছিলেন। হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর অনুসারীদের মধ্যে তেমনই আধ্যাত্মিক বিপ্লব সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন যা আঁ হযরত (সা.) তাঁর সাহাবাদের মাঝে সৃষ্টি করেছিলেন। আমরা আঁ হযরত (সা.)-এর সাহাবদের দৃষ্টান্তের দিকে দৃষ্টি দিলে জানতে পারি যে, সাহাবারা পুণ্যে কর্মে প্রতিযোগিতা করার এমন বাসনা করতেন যে, তাঁরা অনবরত খোদার ইবাদতে মগ্ন থাকতেন এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিত্য নতুন পন্থার কথা চিন্তা করতেন। একবার কিছু দরিদ্র সাহাবা একত্রে আঁ হযরত (সা.)- এর সঙ্গে সাক্ষাত করতে আসেন এবং নিবেদন করেন: হে রসুলুল্লাহ্! আমাদের ধনী ভাইয়েরা আমদের মতই ইবাদত করে, রোযা রাখে আর অন্যান্য পুণ্যকর্মও সম্পাদন করে। কিন্তু একটি দিক এমনও আছে যে ক্ষেত্রে তারা আমাদের থেকে এগিয়ে যাচ্ছে, আমাদের থেকে বেশি পুণ্য অর্জন করছে। সেটি হল তাদের আর্থিক কুরবানী। আর্থিক কুরবানীর বিষয়ে তাদের তৎপরতা আমাদের থেকে বেশি। এক্ষেত্রে আমরা নিতান্ত অসহায়। আমাদেরকে এমন কোনও পন্থা বলুন যার মাধ্যমে আমরা পুণ্যের ক্ষেত্রে তাদের সমকক্ষ হয়ে উঠব। ' এর উত্তরে আঁ হযরত (সা.) বললেন: প্রত্যেক নামাযের পর তেত্রিশ বার সুবহানাল্লাহ্, তেত্রিশবার আলহামদোলিল্লাহ এবং চৌত্রিশ বার আল্লাহু আকবার পাঠ করবে।

আঁ হযরত (সা.) বললেন, তারা যদি এই নির্দেশ মেনে চলেন, তবে তা সদকা খয়রাত ও আর্থিক কুরবানীর এই ব্যবধান মিটিয়ে দিবে। তাই আর্থিক দিক থেকে অনগ্রসর সাহাবারা প্রত্যেক নামাযের পর নীরবে এই শব্দগুলি উচ্চারণ করতে শুরু করলেন। আর্থিকভাবে সমৃদ্ধ সেই ভাইয়েরা যখন দেখল যে, তাদের থেকে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র ভাইয়েরা নামাযের পর মনে মনে কিছু পাঠ করতে ব্যস্ত, তখন তারা এই রহস্য উন্মোচন করতে স্থির করলেন। কিছুক্ষণ পরেই তারা জানতে পারলেন যে, তাদের গরীব ভাইয়েরা যিকরে ইলাহিতে নিমগ্ন আছে আর একথা আঁ হযরত (সা.) তাদেরকে বলেছেন যে, এই যিকর আর্থিকভাবে সমৃদ্ধ মুসলমানদের আর্থিক কুরবানীর মাধ্যমে অর্জিত পুণ্যের ব্যববধান মিটিয়ে দিবে। একথা জানতে পেরে তারাও অনুরূপ যিকরে ইলাহি করতে আরম্ভ করলেন।

এতে সেই গরিব মুসলমানেরা পুনরায় আঁ হযরত (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেন: হে রসুলুল্লাহ্! ধনীরাও এভাবে যিকর করতে আরম্ভ করেছে।' তাদের ইচ্ছে ছিল, আঁ হযরত (সা.) ধনীদেরকে যেন এই যিকর করতে নিষেধ করেন। কিন্তু আঁ হযরত (সা.) বললেন, তাদেরকে নিষেধ করা যেতে পারে না। কেননা আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে পরস্পরের সঙ্গে পুণ্যকর্মের বিষয়ে এগিয়ে যাওয়ার আদেশ দিয়েছেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: অতএব, সাহাবা রিযওয়ানুল্লাহি আলাইহিম এর দৃষ্টান্ত দেখুন। তারা একে অপরকে পুণ্যকর্মে পিছনে ফেলে দেওয়ার জন্য কত ব্যকুল হয়ে থাকতেন। তারা সর্বক্ষণ একে অপরের থেকে পুণ্যে কর্মে এগিয়ে যেতে চাইতেন। তাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন। আঁ হযরত (সা.) এর যে

মহানবী (সা.)-এর বাণী

নিজ হাতে উপার্জিত জীবিকার চেয়ে উত্তম জীবিকা দ্বিতীয়টি নেই। (সহী বুখারী, কিতাবুল বুয়ু)

দোয়াপ্রার্থী: Jahanara Begum, Bhagwangola, (Murshidabad)

হাদীসগুলি আমাদেরকে শোনানো হয়ে থাকে, এগুলি নিছক পুণ্যকর্মের কাহিনী নয় যা শুনে আমাদের মুখস্ত রয়েছে। তাছাড়া এগুলি স্মৃতিতে সাজিয়ে রাখার জন্য কেবল সুবহানাল্লাহ্ উচ্চারণ করাই যথেষ্ট হবে না, বরং এই পবিত্র হাদীসের উপর আমল করার চেষ্টা করতে হবে। আমাদেরকে সেই পবিত্র পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে। আমাদেরকেও সেই সুবর্ণ পথ চলার এবং খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করা উচিত।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এছাড়াও ইবাদত ব্যতিরেকে অন্যান্য আরও অনেক সামাজিক মূল্যবোধ এবং নৈতিক বৈশিষ্ট্যবলী রয়েছে যেগুলি সম্পর্কে খোদা তা'লা আদেশ করেন আমরা যেন সেগুলি নিজেদের জীবনে সৃষ্টি করি। আমাদেরকে তাকিদ করা হয়েছে যে, আমরা যেন সেই পুণ্যকর্মগুলিতে সবসময় এগিয়ে চলার চেষ্টা করতে থাকি। আমাদের জীবনের প্রতি পদে এই পুণ্যকর্মগুলি সম্পাদন করা উচিত। আমাদের মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন সৃষ্টি করতে হবে। অন্যথায় কালক্রমে আমাদের মাঝে সেই সব বিষয়ের চেতনা হারিয়ে যাবে এবং একটি সময় পর আমরা পাপ ও পুণ্যের মাঝে পার্থক্য করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলব। কালের প্রবাহে এই পবিত্র এবং সম্মানীয় সত্তার প্রতি আমাদের ভালবাসা এবং সম্মান কেবল কথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে থেকে যাবে। আরও কিছু সময় পর সেই কথাগুলিও অবশিষ্ট থাকবে না। আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক আহমদীকে এমন পরিণতি থেকে রক্ষা করুন। আমীন।

নিউজিল্যাণ্ডের পার্লামেন্টে হুযুর আনোয়ারের ভাষণ

সকল সম্মানিত অতিথিবৃন্দ– আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু– আল্লাহ্ তা'লার শান্তি ও রহমত আপনাদের সকলের উপর বর্ষিত হোক।

আমি প্রথমে সেই সকলকে, বিশেষ করে মাননীয় সংসদ সদস্য কানওয়ালজিত সিং বকশীকে, ধন্যবাদ জানাতে চাই যারা এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন, এবং আজ আমাকে আপনাদের সম্বোধন করে কিছু বলার সুযোগ করে দিয়েছেন। দ্বিতীয়ত আমি আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই যারা আজ এখানে আমার কথা শোনার জন্য উপস্থিত হয়েছেন। নিশ্চিতভাবে এ পার্লামেন্ট হাউসে, বিভিন্ন রাজনীতিবিদ ও সংসদ সদস্যগণ নিয়মিত বিভিন্ন নীতি ও পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ ও আইন প্রণয়নের জন্য মিলিত হন যেগুলোর প্রতিটিরই উদ্দেশ্য এ দেশকে উন্নতির পথে ধাবিত করা। এ ছাড়াও আমি নিশ্চিত যে অনেক ধর্মনিরপেক্ষ নেতা এখানে এসে থাকবেন এবং তাদের নিজ জ্ঞান, দক্ষতা ও অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আপনাদের সম্বোধন করে থাকবেন। কিন্তু যদিওবা কখনো হয়ে থাকে তবে তা কদাচিৎ–ই হবে যে, কোন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রধান, আর বিশেষ করে কোন মুসলিম নেতা আপনাদের সম্বোধন করেছেন।

তাই আপনারা যে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব প্রধান হিসেবে, যা নিছক একটি ইসলামী সংগঠন এবং যার একমাত্র উদ্দেশ্য ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে ছড়িয়ে দেওয়া, আমাকে আপনাদের সম্বোধন করার সুযোগ দিয়েছেন তা আপনাদের উন্মুক্ত হৃদয় ও এবং অতি উঁচু মানের সহিষ্ণুতার নিদর্শন। সুতরাং আপনাদের এ সানুগ্রহ অভিব্যক্তির জন্য আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।ধন্যবাদ জ্ঞাপনের এ কথাগুলোর সাথে, এখন আমি আমার বক্তৃতার মূল অংশের দিকে অগ্রসর হতে চাই আর ইসলামের অনিন্দ্যসুন্দর শিক্ষামালা সম্পর্কে কিছু কথা বলতে চাই।

আমি সেই বিষয় সম্পর্কে কথা বলবো যা আমার দৃষ্টিতে সময়ের সবচেয়ে সংকটাপন্ন দাবি – আর তা হল বিশ্ব শান্তির প্রতিষ্ঠা। এক ধর্মনিরপেক্ষ আঙ্গিক থেকে আপনাদের অনেকেই, ব্যক্তিগত পর্যায়ে রাজনীতিবিদ হিসেবে আর সমবেতভাবে সরকার হিসেবে শান্তি অর্জনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন। আপনাদের সকল প্রয়াসের পেছনে আপনাদের সৎ উদ্দেশ্য থেকে থাকবে এবং এসব প্রচেষ্টায় আপনাদের কিছু কিছু সফলতাও থেকে থাকবে। উপরন্তু, সময়ের পরিক্রমায়, আপনাদের সরকার এক শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পৃথিবী গড়ার লক্ষ্যে অন্যান্য বৃহৎ শক্তিকে পরামর্শাসমূহ দিয়ে থাকবে।সন্দেহ নাই যে, আজ পৃথিবীর পরিস্থিতি অত্যন্ত সঙ্গীন ও পুরো বিশ্বের জন্য গভীর উদ্বেগের কারণ। যদিও বিশ্বের বড় বড় সংঘাতসমূহের বেশ কয়েকটি আরব বিশ্বে সংঘটিত হচ্ছে, বাস্তবতা হল যে কোন বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি এ বিষয়ে সচেতন থাকবেন যে, এসব সংঘাত কেবল ঐ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকবে না। এতে কোন সন্দেহ নাই যে, একটি দেশের সরকার ও এর জনগণের মধ্যে কোন সংঘাতও বাড়তে বাড়তে অনেকখানি বৃহত্তর এক আন্তর্জাতিক সংঘাতে পরিণত হতে পারে।

ইতিমধ্যেই আমরা লক্ষ্য করছি যে, বিশ্বের বড় বড় শক্তিগুলোর মধ্যে দু'টো ব্লক গঠিত হচ্ছে। একটি ব্লক সিরীয় সরকারকে সমর্থন করছে, আর অপরটি বিদ্রোহী শক্তিকে। সুতরাং স্পষ্টতই এ পরিস্থিতি কেবল মুসলিম দেশগুলোর জন্যই হুমকির কারণ নয়, বরং বাকি বিশ্বের জন্যও চরম বিপদের এক উৎস।গত শতাব্দীতে সংঘটিত দু'টি বিশ্বযুদ্ধের হৃদয়–বিদারক অভিজ্ঞতাকে আমাদের কখনো ভুলে যাওয়া উচিত না। যে ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ এগুলোতে সংঘটিত হয়েছিল, বিশেষতঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে, তা নজিরবিহীন ছিল। কেবল গতানুগতিক অস্ত্র ব্যবহার করে বহুল অধ্যুষিত ও প্রাণচঞ্চল শহর ও নগরসমূহ একেবারে গুঁড়িয়ে দিয়ে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করা হয়েছিল আর কোটি কোটি মানুষ নিহত হয়েছিল। তদুপরি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জগদ্বাসী সেই চরম ধ্বংসাত্মক ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিল যখন জাপানের বিরুদ্ধে এটম বোমা ব্যবহার করা হয়েছিল যা এমন ধ্বংসযজ্ঞ সাধন করেছিল যার বিবরণ শুনতেও গা শিউরে ওঠে ও প্রকম্পিত হয়। যে বিভীষিকা ও ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ সংঘটিত হয়েছিল তা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য হিরোশিমা ও নাগাসাকির জাদুঘরগুলো যথেষ্ট।দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রায় ৭ কোটি মানুষ নিহত হয়েছিল আর বলা হয় যে, নিহতদের মধ্যে ৪ কোটিই ছিল বেসামরিক জনগণ। সুতরাং সামরিক বাহিনীর সদস্যদের

চেয়েও বেসামরিক জনগণ প্রাণের কুরবানী বেশি প্রদান করেছেন। উপরন্তু, যুদ্ধের পরবর্তী পরিণাম ছিল সত্যিই ভীতিপ্রদ, যেখানে যুদ্ধ–পরবর্তী যুদ্ধজনিত

নিউজিল্যাণ্ডের পার্লামেন্টে হুযুর আনোয়ারের ভাষণ

সকল সম্মানিত অতিথিবৃন্দ– আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু– আল্লাহ্ তা'লার শান্তি ও রহমত আপনাদের সকলের উপর বর্ষিত হোক।

আমি প্রথমে সেই সকলকে, বিশেষ করে মাননীয় সংসদ সদস্য কানওয়ালজিত সিং বকশীকে, ধন্যবাদ জানাতে চাই যারা এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন, এবং আজ আমাকে আপনাদের সম্বোধন করে

কিছু বলার সুযোগ করে দিয়েছেন। দ্বিতীয়ত আমি আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই যারা আজ এখানে আমার কথা শোনার জন্য উপস্থিত হয়েছেন। নিশ্চিতভাবে এ পার্লামেন্ট হাউসে, বিভিন্ন রাজনীতিবিদ ও সংসদ সদস্যগণ নিয়মিত বিভিন্ন নীতি ও পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ ও আইন প্রণয়নের জন্য মিলিত হন যেগুলোর প্রতিটিরই উদ্দেশ্য এ দেশকে উন্নতির পথে ধাবিত করা। এ ছাড়াও আমি নিশ্চিত যে অনেক ধর্মনিরপেক্ষ নেতা এখানে এসে থাকবেন এবং তাদের নিজ জ্ঞান, দক্ষতা ও অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আপনাদের সম্বোধন করে থাকবেন। কিন্তু যদিওবা কখনো হয়ে থাকে তবে তা কদাচিৎ–ই হবে যে, কোন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রধান, আর বিশেষ করে কোন মুসলিম নেতা আপনাদের সম্বোধন করেছেন।

তাই আপনারা যে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব প্রধান হিসেবে, যা নিছক একটি ইসলামী সংগঠন এবং যার একমাত্র উদ্দেশ্য ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে ছড়িয়ে দেওয়া, আমাকে আপনাদের সম্বোধন করার সুযোগ দিয়েছেন তা আপনাদের উন্মুক্ত হৃদয় ও এবং অতি উঁচু মানের সহিষ্ণুতার নিদর্শন। সুতরাং আপনাদের এ সানুগ্রহ অভিব্যক্তির জন্য আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।ধন্যবাদ জ্ঞাপনের এ কথাগুলোর সাথে, এখন আমি আমার বক্তৃতার মূল অংশের দিকে অগ্রসর হতে চাই আর ইসলামের অনিন্দ্যসুন্দর শিক্ষামালা সম্পর্কে কিছু কথা বলতে চাই।

আমি সেই বিষয় সম্পর্কে কথা বলবো যা আমার দৃষ্টিতে সময়ের সবচেয়ে সংকটাপন্ন দাবি – আর তা হল বিশ্ব শান্তির প্রতিষ্ঠা। এক ধর্মনিরপেক্ষ আঙ্গিক থেকে আপনাদের অনেকেই, ব্যক্তিগত পর্যায়ে রাজনীতিবিদ হিসেবে আর সমবেতভাবে সরকার হিসেবে শান্তি অর্জনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন। আপনাদের সকল প্রয়াসের পেছনে আপনাদের সৎ উদ্দেশ্য থেকে থাকবে এবং এসব প্রচেষ্টায় আপনাদের কিছু কিছু সফলতাও থেকে থাকবে। উপরন্তু, সময়ের পরিক্রমায়, আপনাদের সরকার এক শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পৃথিবী গড়ার লক্ষ্যে অন্যান্য বৃহৎ শক্তিকে পরামর্শাসমূহ দিয়ে থাকবে।সন্দেহ নাই যে, আজ পৃথিবীর পরিস্থিতি অত্যন্ত সঙ্গীন ও পুরো বিশ্বের জন্য গভীর উদ্বেগের

কারণ। যদিও বিশ্বের বড় বড় সংঘাতসমূহের বেশ কয়েকটি আরব বিশ্বে সংঘটিত হচ্ছে, বাস্তবতা হল যে কোন বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি এ বিষয়ে সচেতন থাকবেন যে, এসব সংঘাত কেবল ঐ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকবে না। এতে কোন সন্দেহ নাই যে, একটি দেশের সরকার ও এর জনগণের মধ্যে কোন সংঘাতও বাড়তে বাড়তে অনেকখানি বৃহত্তর এক আন্তর্জাতিক সংঘাতে পরিণত হতে পারে।

ইতিমধ্যেই আমরা লক্ষ্য করছি যে, বিশ্বের বড় বড় শক্তিগুলোর মধ্যে দু'টো ব্লক গঠিত হচ্ছে। একটি ব্লক সিরীয় সরকারকে সমর্থন করছে, আর অপরটি বিদ্রোহী শক্তিকে। সুতরাং স্পষ্টতই এ পরিস্থিতি কেবল মুসলিম দেশগুলোর জন্যই হুমকির কারণ নয়, বরং বাকি বিশ্বের জন্যও চরম বিপদের এক উৎস।গত শতাব্দীতে সংঘটিত দু'টি বিশ্বযুদ্ধের হৃদয়-বিদারক অভিজ্ঞতাকে আমাদের কখনো ভুলে যাওয়া উচিত না। যে ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ এগুলোতে সংঘটিত হয়েছিল, বিশেষতঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে, তা নজিরবিহীন ছিল। কেবল গতানুগতিক অস্ত্র ব্যবহার করে বহুল অধ্যুষিত ও প্রাণচঞ্চল শহর ও নগরসমূহ একেবারে গুঁড়িয়ে দিয়ে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করা হয়েছিল আর কোটি কোটি মানুষ নিহত হয়েছিল। তদুপরি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জগদ্দাসী সেই চরম ধ্বংসাত্মক ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিল যখন জাপানের বিরুদ্ধে এটম বোমা ব্যবহার করা হয়েছিল যা এমন ধ্বংসযজ্ঞ সাধন করেছিল যার বিবরণ শুনতেও গা শিউরে ওঠে ও প্রকম্পিত হয়। যে বিভীষিকা ও ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ সংঘটিত হয়েছিল তা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য হিরোশিমা ও নাগাসাকির জাদুঘরগুলো যথেষ্ট। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রায় ৭ কোটি মানুষ নিহত হয়েছিল আর বলা হয় যে, নিহতদের মধ্যে ৪ কোটিই ছিল বেসামরিক জনগণ। সুতরাং সামরিক বাহিনীর সদস্যদের চেয়েও বেসামরিক জনগণ প্রাণের কুরবানী বেশি প্রদান করেছেন। উপরন্তু, যুদ্ধের পরবর্তী পরিণাম ছিল সত্যিই ভীতিপ্রদ, যেখানে যুদ্ধ-পরবর্তী যুদ্ধজনিত মৃত্যুর সংখ্যাও কয়েক মিলিয়নে গিয়ে ঠেকেছে। নিউক্লিয়ার বোমা ব্যবহারের বহু বছর পরও এর তেজস্ক্রীয়তা নবজাত শিশুদের উপর মারাত্মক অবক্ষয়ী প্রভাব বিস্তার করেছে।

আজকের পৃথিবীতে এমনকি কতক ক্ষুদ্র রাষ্ট্রেও নিউক্লিয়ার মারণাস্ত্রের অধিকারী আর তাদের নেতারাও যুদ্ধবাজ। মনে হয়, তাদের কৃতকর্মের বিধ্বংসী পরিণাম সম্পর্কে তারা বেপরোয়া। আর তাই যদি আমরা কল্পনা করি যে, আজ একটি নিউক্লিয়ার যুদ্ধ সংঘটিত হচ্ছে, তবে যে চিত্র সামনে আসে তা কাউকে আতঙ্কে প্রকম্পিত ও বিহ্বল করে দেয়। যে এটম বোমাগুলো আজ ছোট ছোট দেশের হাতে আছে সেগুলোও সম্ভবত সেই বোমাগুলোর চেয়ে শক্তিশালী যেগুলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত হয়েছিল। আর তাই এ পৃথিবীতে যারা শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চায় এবং যারা এ উদ্দেশ্যে কাজ করছে সংঘাত ও অস্থিতিশীলতার এ পরিবেশ তাদের মনে কেবল গভীর উদ্বেগেরই সঞ্চার করতে পারে।

আজকের পৃথিবীর মর্মপীড়াদায়ক অবস্থা এই যে, এক দিকে মানুষ শান্তি প্রতিষ্ঠার কথা বলছে, অপরদিকে তারা নিজেরাই আত্মকেন্দ্রিকতায় ডুবে আছে আর অহংকার ও ঔদ্ধত্যের এক চাদরে মুড়ে আছে। নিজ শ্রেষ্ঠত্ব ও শক্তিমত্তা প্রমাণের জন্য সকল শক্তিশালী সরকার সম্ভাব্য সকল পন্থা অবলম্বন করতে প্রস্তুত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, বিশ্বে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা ও ভবিষ্যৎ যুদ্ধ প্রতিরোধের প্রয়াসে রাষ্ট্রসমূহ একত্রিত হয়ে এক প্রতিষ্ঠান গঠন করেছিল, যার নাম তারা দিয়েছিল জাতিসংঘ। কিন্তু যেভাবে লীগ অফ নেশন্‌স তার লক্ষ্য পূরণে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছিল, মনে হচ্ছে ঠিক একইভাবে জাতিসংঘের অবস্থান ও মর্যাদার দিন দিন অবনতি হচ্ছে। যদি ন্যায়ের দাবি পূরণ না হয়, তবে শান্তির উদ্দেশ্যে যত প্রতিষ্ঠানই গঠন করা হোক না কেন, তাদের প্রয়াস নিষ্ফল সাব্যস্ত হবে।

আমি এইমাত্র লীগ অফ নেশন্‌স এর কথা বললাম। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্ব শান্তি রক্ষার একক উদ্দেশ্য নিয়ে এটি গঠিত হয়; অথচ এটি, যেভাবে আমি বর্ণনা করেছি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগমনকে রুখতে পারে নি, যার সম্পর্কে আমি ইতিমধ্যেই বর্ণনা করেছি যে, তা কীরূপ ধ্বংসযজ্ঞ ও ক্ষয়ক্ষতির কারণ হয়েছে। নিউজিল্যান্ডও এ যুদ্ধে প্রাণহানির স্বীকার হয়েছে। বলা হয় যে, প্রায় ১১,০০০ জনের প্রাণের ক্ষতি এ দেশ স্বীকার করে, যার প্রায় সকলেই ছিলেন সামরিক বাহিনীর সদস্য। যেহেতু নিউজিল্যান্ড যুদ্ধের কেন্দ্র থেকে বহু দূরে ছিল, সেহেতু এখানে বেসামরিক প্রাণহানি ঘটে নি। কিন্তু যেমনটি আমি ইতিমধ্যেই উল্লেখ করেছি, সার্বিকভাবে এ যুদ্ধে সামরিক বাহিনীর সদস্যের চেয়ে নিরীহ বেসামরিক জনগণ অধিক সংখ্যায় নিহত হয়েছিল। একটু কল্পনা করুন: সাধারণ নিরীহ মানুষ, অগণিত নারী ও শিশুসহ, বিনা অপরাধে নির্বিচারে নিহত হয়েছিল। এ কারণেই, যে সকল দেশ সরাসরি সেই যুদ্ধের মধ্যে পতিত হয়েছিল, তাদের জনগণের মাঝে যুদ্ধের প্রতি এক সুগভীর ঘৃণা আপনারা দেখতে পাবেন। নিশ্চিতভাবে নিজ দেশকে এমনভাবে ভালবাসা প্রত্যেক নাগরিকের দায়িত্ব যেন যদি এ দেশ কখনো আক্রান্ত হয়, তখন যেন এর প্রতিরক্ষায় এবং দেশকে মুক্ত করতে যে কোন আত্মত্যাগে সে প্রস্তুত থাকে। তথাপি, যদি বিরোধের নিষ্পত্তি সৌহার্দ্য ও শান্তিপূর্ণ পথে আলোচনা ও কূটনীতির মাধ্যমে করা সম্ভব হয়, তবে অকারণে মৃত্যু ও প্রাণহানি ডেকে আনা উচিত না। অতীতে যখন যুদ্ধ হত, যুদ্ধে মূলত সামরিক সদস্যরাই হতাহত হত, আর বেসামরিক প্রাণহানি হত অতি নগণ্য।

কিন্তু আজকের যুদ্ধের মাধ্যমসমূহের মধ্যে রয়েছে আকাশ থেকে বোমাবর্ষণ, বিষাক্ত গ্যাস এমনকি রাসায়নিক সমরাস্ত্র। আর যেমনটি আমি বলেছি, সবচেয়ে ভয়াবহ অস্ত্র - নিউক্লিয়ার বোমা - ব্যবহারের সম্ভাবনা তো রয়েছেই। পরিণামস্বরূপ আজকের যুগের যুদ্ধগুলো অতীত থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, কেননা আজকের যুদ্ধগুলো পৃথিবীর বুক থেকে মানবজাতিকে মিটিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। এ মুহূর্তে আমি শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের একটি সুন্দর শিক্ষা পেশ করতে চাই। কুরআন বলে: এবং ভাল ও মন্দ সমান নয়। উহা দ্বারা (মন্দকে) প্রতিহত কর যা সর্বোত্তম। ফলে সহসা ঐ ব্যক্তি যার মধ্যে এবং তোমার মধ্যে শত্রুতা রয়েছে, অন্তরঙ্গ বন্ধুর ন্যায় হয়ে যাবে। (৪১:৩৫)

সুতরাং কুরআন শিক্ষা দেয় যে, যতদূর সম্ভব, যেকোন বিরোধ বা অভিযোগের ক্ষেত্রে যোগাযোগের রাস্তাসমূহ খুলে দিয়ে সংলাপের মাধ্যমে আপস ও নিস্পত্তি করা উচিত। নিশ্চিতভাবে, কারো সাথে দয়া ও প্রজ্ঞার সাথে কথা বলাতে তাদের হৃদয়ের উপর সুদূরপ্রসারী ইতিবাচক প্রভাব পড়ে এবং বিদ্বেষ ও অভিযোগসমূহ দূর হয়।সন্দেহ নাই যে, এ যুগে আমরা নিজেদেরকে অত্যন্ত উন্নত ও সভ্য বলে মনে করি। আমরা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সেবামূলক সংস্থা ও ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেছি যেগুলো শিশুদের জন্য স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সেবা প্রদান করে থাকে বা যাদের জন্য স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করে থাকে। অনুরূপভাবে আরো অগণিত সেবামূলক সংস্থা রয়েছে যেগুলো নেহায়াতই মানবীয় সহানুভূতি ও সহমর্মিতা থেকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আমরা যারা এত কিছু করেছি, তাদের এ চিন্তায় অভিনিবেশ ও মনোযোগ দান করা উচিত যে, সময়ের দাবি কী আর এ বিষয়ে চিন্তা করা উচিত যে, আমরা কীভাবে নিজেদেরকে ও অন্যান্যদেরকে ক্ষয়ক্ষতি ও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারি। আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে ছয় বা সাত দশক পূর্বের তুলনায় আজ পৃথিবী অনেক কাছাকাছি চলে এসেছে। ষাট-সত্তর বছর পূর্বে নিউজিল্যান্ড ছিল দূরবর্তী একটি দেশ, এশিয়া ও ইউরোপ থেকে বহু দূরে।

কিন্তু আজ এটি এক সামগ্রিক বিশ্বজনীন সম্প্রদায়ের অংশ। তাই যুদ্ধ শুরু হলে কোন দেশ বা কোন অঞ্চলই নিরাপদ নয়।আপনাদের নেতৃবৃন্দ ও রাজনীতিবিদগণ জাতির অভিভাবক। দেশে নিরাপত্তা ও উত্তরোত্তর উন্নতি ও অগ্রযাত্রার জন্য তারা দায়ী। আর তাই এটি আবশ্যক যে, তারা যেন সবসময় তাদের মানসপটে এ বিষয়টি রাখেন যে, স্থানীয় যুদ্ধসমূহ থেকেই ক্ষয়ক্ষতি ও ধ্বংস দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে। আমাদের খোদা তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে, সাম্প্রতিক সময়ে তিনি কতক বৃহৎ শক্তিকে এ জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করেছেন যে, তারা অনুভব করেছে যে, ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ থেকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ থামানোর লক্ষ্যে তাদেরকে ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। বিশেষ করে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট অন্যান্য কতক বৃহৎ শক্তিকে সিরিয়ার উপর আক্রমণ করা থেকে বিরত করতে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি স্পষ্ট করেছিলেন যে, ছোট-বড় সকল দেশের প্রতিই সমান আচরণ করা উচিত। তিনি আরো বলেছেন যে, যদি ন্যায়ের দাবিকে পূর্ণ না করা হয় আর যদি কতক দেশ নিজে থেকেই যুদ্ধ ঘোষণা করে তবে জাতিসংঘেরও সেই দুঃখজনক পরিণতি হবে যা লীগ অব নেশন্‌স এর হয়েছিল। আমি বিশ্বাস করি যে, এ বিশ্লেষণে তিনি সম্পূর্ণ সঠিক ছিলেন। যদিও আমি তার সকল

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol-7 Thursday, 28 April, 2022 Issue No. 17

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 575/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

নীতির সমর্থন করি না। কিন্তু প্রজ্ঞাপূর্ণ কথাকে গ্রহণ করা উচিত। আমার আফসোস যে, তিনি আরেক ধাপ এগিয়ে গিয়ে এ কথা বলেন নি যে, জাতিসংঘের প্রতিরক্ষা পরিষদের পাঁচ স্থায়ী সদস্যের যে, ভেটো প্রদানের অধিকার রয়েছে তা চির দিনের মত শেষ করে দেওয়া উচিত যাতে সকল জাতির মধ্যে প্রকৃত ন্যায় ও সমতা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

গত বছর, আমি একটি সুযোগ পেয়েছিলাম ওয়াশিংটন ডি.সি.-র ক্যাপিটল হিল-এ বক্তৃতা করার। শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সিনেটর, কংগ্রেসম্যান, থিংক-ট্যাংক প্রতিনিধি ও বিভিন্ন মহলের শিক্ষিত জন। আমি তাদেরকে স্পষ্ট বলেছি যে, ন্যায়ের দাবি কেবল তখনই পূর্ণ হতে পারে যখন সকল পক্ষ ও মানুষের সাথে সমান আচরণ করা হয়। আমি তাদেরকে বলেছি যে, যদি আপনারা ছোট-বড় বা ধনী-গরীব দেশের মধ্যে পার্থক্যকে জোরালো করতে চান আর ভেটো ক্ষমতার, অন্যায্যতাকে বজায় রাখতে চান তবে অস্থিরতা ও উদ্বেগ নিশ্চিতরূপে মাথা চাঁড়া দিবে। এমন অস্থিরতা ইতিমধ্যেই বিশ্বে উদ্ভূত হতে শুরু করেছে।আর তাই নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রধান হিসেবে এটি আমার কর্তব্য যে, আমি বিশ্বের দৃষ্টি শান্তি স্থাপনের দিকে আকর্ষণ করি। আমি এটিকে আমার দায়িত্ব মনে করি, কেননা ইসলামের অর্থই হল শান্তি ও নিরাপত্তা। যদি কতক মুসলিম দেশ বিদ্বেষপ্রসূত চরমপন্থী আচরণ করে বা উৎসাহিত করে, এর ফলে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ঠিক হবে না যে, ইসলামের শিক্ষাসমূহ বিশৃংখলা ও অরাজকতার বিস্তার ঘটায়। আমি একটু আগেই পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত পাঠ করেছি এবং তাতে বর্ণিত শান্তি প্রতিষ্ঠার শিক্ষা উপস্থাপন করেছি।তদুপরি, ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) তার অনুসারীদের সবসময় "সালাম" দেওয়ার শিক্ষা দিয়েছেন, যার অর্থ হল সর্বদা শান্তি বার্তা প্রচার করা। তাঁর কল্যাণময় দৃষ্টান্ত থেকে আমরা জানি যে, তিনি সকল অমুসলিমকে, তারা ইহুদী, খ্রিষ্টান বা অন্য ধর্মাবলম্বী যাই হন না কেন, সালাম দিয়ে সম্ভাষণ করতেন। তিনি এমনটি এজন্যই করতেন যে তিনি অনুধাবন করেছিলেন যে সকল মানুষই খোদার সৃষ্টি, আর যেহেতু খোদা তা'লার একটি নাম হল "শান্তির উৎস" আর তাই তিনি মানবজাতির জন্য শান্তি ও নিরাপত্তা কামনা করেন।আমি শান্তি সম্পর্কে ইসলামের কিছু শিক্ষা বর্ণনা করেছি, কিন্তু আমার স্পষ্ট করা উচিত যে, সময়ের সীমাবদ্ধতার কারণে আমি কেবল কতকগুলো দিকেরই উল্লেখ করতে পেরেছি। প্রকৃতপক্ষে, সকল মানুষের শান্তি ও নিরাপত্তার শিক্ষা প্রদান করে আদেশ ও উপদেশে ইসলাম পরিপূর্ণ। আর ন্যায় প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে কুরআন কী বলে? সূরা আল মায়েদার ৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন:হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ন্যায়পরায়ণতার উপর সাক্ষী হিসেবে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হও। এবং কোন জাতির শত্রুতা যেন তোমাদেরকে আদৌ এই অপরাধ করতে প্ররোচিত না করে যে, তোমরা ন্যায়বিচার না কর। তোমরা সুবিচার করো, ইহা তাক্ওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী। এবং আল্লাহ্‌র তাক্ওয়া অবলম্বন কর। আর তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।(৫:৯)

আর তাই কুরআনের এ আয়াতে ন্যায়ের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ মান তুলে ধরা হয়েছে। যারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবি করে তাদের জন্য এ আদেশ নৃশংসতা ও বর্বরতার কোন অবকাশ রাখে নি। আর না এটি তাদের জন্য কোন অবকাশ রেখেছে যারা ইসলামকে এক সহিংস ও চরমপন্থী ধর্ম হিসেবে প্রতিফলিত করতে চায়। পবিত্র কুরআনে ন্যায়বিচার ও সমতার সবচেয়ে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এটি কেবল ন্যায় আচরণ করতেই বলে নি, বরং এমন পর্যায় পর্যন্ত পক্ষপাতহীনতার দাবি করেছে যে, এতে বলা হয়েছে:হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা ন্যায়পরায়ণতার উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হও আল্লাহ্‌র জন্য সাক্ষী হিসেবে, যদিও (তোমাদের সাক্ষ্য) তোমাদের নিজেদের বা তোমাদের পিতা-মাতাদের বা তোমাদের স্বজনদের বিরুদ্ধেই যায়। (যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়া হবে) যদি সে ধনী হয় বা দরিদ্র, তাহলে আল্লাহ্ (তোমার অপেক্ষা) তাদের উভয়েরই অধিক শুভাকাঙ্ক্ষী। সুতরাং তোমরা হীন কামনার অনুসরণ করো না যেন তোমরা ন্যায়বিচার করতে পারো। এবং যদি তোমরা কথাকে পেঁচিয়ে (সত্য) গোপন কর অথবা এড়িয়ে যাও, তাহলে (জেনে রাখো যে) তোমরা যা কিছু কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।(৪:১৩৬) আর তাই এটি ন্যায়ের এমন নীতিপূর্ণ মান যা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে, সমাজের সবচেয়ে মৌলিক একক থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক পরিসর পর্যন্ত। ইতিহাস সাক্ষী যে, ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এ শিক্ষার উপর আমল করেছেন এবং একে প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর আজ এ যুগে, মহানবী (সা.) এর প্রকৃত শিষ্য, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) এ শিক্ষার প্রচার ও প্রসার করেছেন এবং নিজ অনুসারীদেরও শান্তি বিস্তারের আদেশ দিয়েছেন। তিনি তাঁর অনুসারীদেরকে আরো আদেশ দিয়েছেন যেন যারা খোদা তা'লার হক ও খোদা তা'লার সৃষ্টির হক আদায়ের দিকে মানবজাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এ কারণেই আহমদীয়া সম্প্রদায় সকলের নিকট আল্লাহ্ তা'লার অধিকার ও তাঁর সৃষ্টির অধিকার আদায়ের এবং ন্যায়ের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ মান প্রতিষ্ঠার অতীব গুরুত্বপূর্ণ দাবির প্রতি সকল মানুষকে তাগিদপূর্ণ উপদেশ দিয়ে আসছে। আমার দোয়া এই যে, ধর্ম বা বিশ্বাস নির্বিশেষে, আমাদের প্রত্যেকে যেন একে অপরের প্রাপ্য অধিকার আদায়ের বিষয়ে মনোনিবেশী হই, যেন এ পৃথিবী শান্তি ও সৌহার্দ্যের এক নীড়ে পরিণত হতে পারে।

এ কয়েকটি কথার সাথে আজ আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানিয়ে আমার কথাগুলো শোনার জন্য আমি আপনাদের আরো একবার ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি।

১ম পাতার শেষাংশ.....

আর কিসের বাসনা করে? মোটকথা রোযার মাধ্যমে দরিদ্রদেরকে এ বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, এই অভাব অনটনের সময়ও যদি সংযম দেখাতে পারে, অকৃতজ্ঞ না হয় ,অভিযোগ মুখে না আনে, তবে এই অনাহার যাপনই তাদের জন্য পুণ্য হয়ে উঠবে আর স্বয়ং খোদা এর প্রতিদান হবেন। কিন্তু অনেক নির্বোধ আছে যারা অভিযোগ করে যে খোদা তা'লা আমাদেরকে কি দিয়েছেন যার জন্য নামায পড়তে হবে, রোযা রাখতে হবে? সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা রোযাকে দরিদ্রদের জন্য প্রশান্তির কারণ বানিয়েছেন যাতে তারা নিরাশ না হয় আর একথা না বলতে পারে যে, বৃথা আমাদের অভাব অনটন আর বৃথা আমাদের অনাহার যাপন। আল্লাহ্ তা'লা রোযায় তাদেরকে এই গোপন চাবিকাঠি বলে দিয়েছেন যে, তারা যদি এই অভাব অনটনপূর্ণ এই জীবনকে খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অনুসারে অতিবাহিত করে, তবে এটাই তাদেরকে খোদার সঙ্গে

১২৭ তম বাৎসরিক জলসা কাদিয়ান

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) ২০২২ সালের জলসা সালানা কাদিয়ানের জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল ২৩, ২৪ ও ২৫ শে ডিসেম্বর ২০২২ (শুক্র, শনি ও রবিবার)। জামাতের সদস্যগণ এখন থেকেই দোয়ার সাথে এই মোবারক জলসায় অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। এই জলসা সালানার সার্বিক সফলতার ও বরকত মণ্ডিত হওয়ার জন্য এবং হেদায়েতের কারণ হওয়ার জন্য দোয়ায় রত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ্ ওয়া আহ্সানুল জাযা।

(নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাজিয়া, কাদিয়ান)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir